শ্রীযুক্ত শশিশেখর পাল

শ্রদ্ধাস্পদেষু

*　　*　　*　　*

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

পরিবার পরিকল্পনা (২য় সংস্করণ)
যৌনপ্রসঙ্গে (২য় সংস্করণ)
Theory and Practice of Contraception

ভূমিকা

এই গ্রন্থ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে। কী ভাবে, কী দিয়ে, কেমন করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাফল্যের সঙ্গে গর্ভরোধ করতে হবে তারই খুঁটিনাটি আলোচনা গ্রন্থটিতে ছড়িয়ে আছে। এ সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা ও আরও চিত্রবহুল তথ্যের জন্যে আমার অন্য গ্রন্থ 'পরিবার পরিকল্পনা' দ্রষ্টব্য। বলাই বাহুল্য, শেষোক্ত গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও ডাক্তারদের জন্যেই।

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৮
ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ক্লিনিক,
পি-৩৫, বি. কে. পাল এভেন্যু
কলিকাতা-৫

শ্রীমদন রাণা

সূচীপত্র

অবতরণিকা	...	১-২৮
স্বাভাবিক পদ্ধতি	...	২৯-৫২
আবরণীমূলক পদ্ধতি	...	৫৩-৮৬
রাসায়নিক পদ্ধতি	...	৮৭-১০২
পদ্ধতি চাই, ঘরেই আছে !	...	১০৩-১১০
কিছুই নেই, বলছি শোন !	...	১১১-১১৩
দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি	...	১১৪-১১৮
বন্ধ্যাকরণ প্রসঙ্গে	...	১১৯-১২৩
জন্মনিয়ন্ত্রণে প্রগতির ধারা	...	১২৪-১২৭
পরিশিষ্ট (১)—জন্মরোধক পদ্ধতি নির্বাচন	...	১২৮-১২৯
পরিশিষ্ট (২)—জন্মনিয়ন্ত্রণের সারকথা	...	১২৯-১৩১
পরিশিষ্ট (৩)—জন্মরোধক দ্রব্যাদির তালিকা	...	১৩২-১৩৩
পরিশিষ্ট (৪)—জন্মরোধক দ্রব্যাদির প্রাপ্তিস্থান	...	১৩৩

জন্মনিয়ন্ত্রণ

অবতরণিকা

মানুষ, প্রকৃতির সব কিছু কোনদিন দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নেয়-নি। অসহায় হয়েও মাথা নোয়ায়-নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে-নি। নদী, আলো, জল, বাতাস, সবই আয়ত্তে এনেছে বিজ্ঞানের দৌলতে। কিন্তু প্রকৃতি জয়ের চরম উদাহরণ হল ইচ্ছামত গর্ভরোধ। বিজ্ঞানের আলোয় মানুষ প্রজননবিহীন দেহমিলনের পথ দেখেছে। এই পথই হল জন্মনিয়ন্ত্রণ।

জন্মনিয়ন্ত্রণের অনেক মত ও পথ আছে। আছে অনেক পদ্ধতি আর প্রক্রিয়া। এদের সাহায্যে সন্তানজন্ম নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এদের প্রায় সবকটিই বারণোপায় বিশেষ অর্থাৎ সন্তান আদৌ যাতে না জন্মে সেই ধরনের নিবারণমূলক পদ্ধতি। আরেক ধরনের নিয়ন্ত্রণ আছে, এটা সন্তান জন্মাবার পর প্রয়োগ করা হয়। ঋতুবন্ধে অব্যর্থ জাতীয় ঔষধ, গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদির আশ্রয়ে সন্তান নষ্ট করেও জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক ধরনের প্রাচীন পদ্ধতি হলেও, এটা কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণে পড়ে না। একারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা বার্থ কণ্ট্রোল কথাটি প্রয়োগ করতে অনেকেই নারাজ। এর বদলে গর্ভনিয়ন্ত্রণ বা কন্‌সেপ্‌শন্ কণ্ট্রোল, কণ্ট্রাসেপ্‌শন্, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ফ্যামিলি ওয়েল্‌ফেয়ার প্রভৃতি গালভরা শব্দের পক্ষপাতী অনেকেই। আমরা কিন্তু 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'

কথাটির স্বপক্ষে এবং এটাই ব্যবহার করব, কেননা এর সঙ্গে পরিচয় সকলেরই। তাছাড়া এটি শ্রুতিমধুর আর ডাঃ হ্যাভলক্ এলিসও শব্দটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কি ও কেন?—জন্মনিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা বুঝি: যে কোন উপায়ে বা পদ্ধতির আশ্রয়ে মিলনের তৃপ্তিটুকু বজায় রেখে, ইচ্ছামত নির্দিষ্ট কালের জন্যে সন্তানের জন্মদান ঠেকিয়ে রাখা। ফ্যামিলি হবার আগে প্ল্যান করা, পরে নয়। একবার গর্ভ দানা বাঁধলে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ নিরুপায়। মাসিক বন্ধ হলে অথবা গর্ভাধান ঘটে গেলে, এ-ও-তা প্রয়োগের অর্থ জন্মনিয়ন্ত্রণ নয়, গর্ভপাতই। একারণে, সন্তান নিয়ন্ত্রণ বলুন আর জন্মনিয়ন্ত্রণই বলুন সব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য হল গর্ভনিয়ন্ত্রণ। সোজা কথায়, গর্ভ যাতে না ঘটে তারই জন্যে এই নিবারণমূলক পদ্ধতি এবং এরই নাম জন্মনিয়ন্ত্রণ।

অনেকেরই ধারণা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে কিছু-না-কিছু যেমন, কন্ডম্, জেলী ইত্যাদি প্রয়োগ করতেই হবে। এটা কিন্তু ভুল। পথ যাই হোক না কেন, লক্ষ্য যদি থাকে গর্ভরোধ, অবলম্বিত যে কোন উপায়, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, সবই জন্মরোধক হতে বাধ্য। একারণে কন্ডম্ পরাও যা, বাইরে বীর্যপাত করাও তাই। মিলন শেষে অঙ্গ সঞ্চালনেরও সেই অর্থ। অর্থাৎ কোন কিছু প্রয়োগ না করেও জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

যৌনতৃপ্তি প্রায় পুরোপুরি বজায় রেখে প্রজনন ক্ষমতাকে অব্যাহতি দেওয়াই জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য দুটিকে পৃথকীকরণের জন্যেই এর সৃষ্টি। স্বাভাবিক অনিয়ন্ত্রিত দেহমিলনের তৃপ্তিটুকু আছে অথচ অবাঞ্ছিত গর্ভাধানের ফললাভ নেই, নিয়ন্ত্রিত মিলনের এটাই মূল লক্ষ্য। এর অর্থ এই নয় যে সারাজীবন ধরে পুত্রকন্যাবিহীন নিরুপদ্রব যৌনশান্তি উপভোগের জন্যেই এর জন্ম।

পরন্তু, ইচ্ছামত সন্তানজন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং মনের মত সন্তানসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখাই এর কাজ আর এটাই হল জন্মনিয়ন্ত্রণের সব চেয়ে বড় কথা।

ইতিহাস—'জন্মনিয়ন্ত্রণ' কথাটির জন্ম ১৯১৪ সালে। এর জননী হলেন চিরমহীয়সী মার্গারেট স্যাঙ্গার। এর আগে নব্য-ম্যালথাসবাদ নামে এক নীরস শব্দের আশ্রয়ে এই অর্থটি প্রকাশ পেত। সভ্য মানুষের প্রয়োজনে নতুন নাম নিয়ে নতুন রূপে দেখা দিলেও, এটা আদৌ নতুন নয়। তবে ব্যাপক আন্দোলন হিসেবে এটা যে নতুন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সামাজিক প্রথা হিসেবে এটা অতি প্রাচীন, অতি পুরাতন। এটা যে শুধু মানুষের মধ্যেই সীমিত তা নয়, জীবজগতের প্রতিটি স্তরে এর প্রকাশ্য চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। প্রাণের বিস্তার দেখলেই, সঙ্কোচন যে সেই সঙ্গে দেখতে পাব তাতে কোন ভুল নেই। তাই, প্রকৃতির সঙ্গে এর পরিচয় চিরকালের, জীবজগতে এটা নতুন কিছু আমদানি নয়।

জীবজগতে এই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের খাদের মধ্যে দিয়েই ত' ক্রম-বিকাশের ধারা বয়ে গেছে। এই পথ ধরেই ত' ডারউইন তাঁর অভি-ব্যক্তিবাদের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। সন্তানসংখ্যা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সবকটি বেঁচে থাকত তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ বদলে যেত। প্রাণীর দাপটে মানুষ হয়ত মঙ্গল গ্রহে পালিয়ে যেতে বাধ্য হত। 'জীবন সংগ্রাম' আর 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' ছিল বলেই রক্ষে।

বুড়ো পৃথিবীটার মত এরও বয়স অনেক। তাই, মনুষ্যজগতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ইতস্তত আর বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা দেখতে পাই। সভ্যতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এরা নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল। অর্থাৎ প্রাচীনতম অভ্যাসটি আগেও ছিল, এখনও আছে, শুধু রূপ বদল হয়েছে এই যা।

ইতিহাসের উল্টোদিকে যতই পিছিয়ে যাই না কেন, প্রাগৈতিহাসিক, অসভ্য, প্রস্তর, লৌহ ও সভ্য প্রভৃতি প্রতিটি যুগেই জন্মরোধের নিদর্শন ছড়ানো আছে। ইতিহাসের শুরুতে আদিম বর্বর, তারপর বুনো শিকারী, তারপর চাষী, সেখান থেকে আজকের শিক্ষিত ও সভ্য সমাজ, যে স্তরেই দৃকপাত করি না কেন, প্রত্যেক সমাজের লোকেরাই সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে চেষ্টা করেছে।

প্রকৃতি এ ব্যাপারে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করলেও মানুষ নিজের চেষ্টাতেও (যুদ্ধ ও নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ে) একাজ চালিয়ে এসেছে। প্রজনন ক্ষমতার পায়ে বেড়ী পরাতে গিয়ে মানুষ নানাবিধ যৌননীতির সৃষ্টি করল। বিবিধ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ মিলনের (টাবু) বেড়া দিয়ে গর্ভহার কমিয়ে ফেলতে চেষ্টা করত। আর, এই বেড়া ডিঙিয়ে অবাঞ্ছিত সন্তান দেখা দিলে, গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা, এমন কি শিশুহত্যা করতেও এরা পেছপা হতনা। এমনি করেই তখনকার দিনের মানুষ 'ক্ষুদ্র পরিবার প্রথাটি' জিইয়ে রেখে দিত। অর্থাৎ জন্মরোধের জন্যে এদের হাতিয়ার ছিল টাবু, ভ্রূণহত্যা কিংবা শিশুহত্যা।

শুধু যে প্রাক্-সভ্য যুগে এদের প্রচলন ছিল তা নয়, সভ্যতাসৃষ্টির পরও এই স্থূল পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হত। প্রাচীন গ্রীসে ও চীনে শিশু হত্যার রেওয়াজ ছিল, এখনও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। সভ্য সমাজে এর নিদর্শন এখনও যে মেলেনা তা নয়।

যাই হোক, সে সময়ে সমাজের অনুমোদন পেতে কোন বাধা ছিল না বলেই এগুলি চালু ছিল। কালস্রোতে সবই বদলে গেল, সামাজিক রীতিনীতির ওলটপালট হল, কালকে যেটা গৌরবের ছিল আজকে সেটা অসম্মানের হল।

গর্ভপাত আইন করে বেঁধে দেওয়া হল। গর্ভপাত করতে গিয়ে শারীরিক দুঃখকষ্ট ও অর্থব্যয় আর এক অন্তরায় হল। শিশুহত্যায়

খুনের দায়ে পড়তে হয় আর পিতামাতার কোমলবৃত্তিও ক্ষত-বিক্ষত হয়। বাকী রইল টাবু। দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য যে কত বেদনার, মনের ও দেহের, তা ভুক্তভোগীই জানে। অর্থাৎ পূর্বপ্রচলিত কোন পন্থাই আজকের দিনে প্রযোজ্য নয়। এদিকে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আগের মতই রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এই নিয়ন্ত্রণের ভার প্রকৃতি দেবীর হাতে ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সম্মুখীন হব তাও চাইনা। স্থূলতম পদ্ধতি নেব না, প্রকৃতির হাতেও ছেড়ে দেব না, এ প্রশ্নের একমাত্র সমাধান হল আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের হাত ধরে এগিয়ে চলা। এই আধুনিকী হাতিয়ার শিশুহত্যার মত করুণ নয়, গর্ভপাতের মত অবৈধ নয়, টাবু প্রয়োগের মত বেদনাদায়কও নয়। আজকের জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারা সর্বতোভাবে আধুনিক হলেও এই শাস্ত্র, এই জনসমস্যা আদৌ সাম্প্রতিককালের নয়। এটা যে সর্বকালে, সর্বসমাজে ছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জন্মরোধক শাস্ত্রের চর্চা প্রাচীন ভারত, চীন, জাপান, জাভা, মিশর, গ্রীস, রোম ও ইসলাম রাজ্যেও ছিল। এমন কি আফ্রিকা, নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও এই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। অর্থাৎ জীবজগতের সংখ্যানিয়ন্ত্রণ ও পুরাকালের জন্মনিয়ন্ত্রণই আজ গর্ভনিয়ন্ত্রণ নামে পরিচিত হয়েছে।

জননেন্দ্রিয়

যৌনাঙ্গের কার্যকলাপ মূলত দুটি, গর্ভাধান আর যৌনক্রিয়া। যৌনাঙ্গ এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে এর প্রতিটি অঙ্গই যেন গর্ভোৎপাদনের জন্যে উৎসর্গীকৃত। মুখ্য উদ্দেশ্য গর্ভাধান বলেই এদের নাম জননেন্দ্রিয়। এখন, পুরুষ ও নারীর জননেন্দ্রিয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব।

প্রজননের জন্যে পুরুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল পুরুষাঙ্গ আর শুক্রাশয় (১নং ছবি)। এরা থাকে বাইরে। শিথিল পুরুষাঙ্গ

অণ্ডকোষের উপরে পড়ে থাকে। দৈর্ঘ্য দুই থেকে চার ইঞ্চি আর এক ইঞ্চি থেকে সওয়া ইঞ্চি এর ব্যাস। কোমল অঙ্গটি নরম স্পঞ্জের
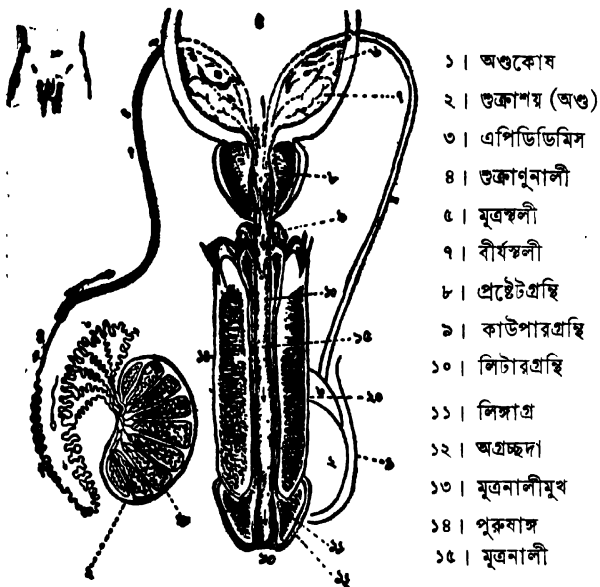
১নং ছবি—পুংজননেন্দ্রিয়

২০। মৌমাছির চাকের মত পুরুষাঙ্গের অভ্যন্তর

২১। শুক্রকীটোৎপাদিকা নলিকারাজি (এখানে শুক্রকীট উৎপন্ন হয়)

মত অজস্র কোষের সমন্বয়ে তৈরী। উত্তেজিত হলে এই কোষে প্রচুর রক্ত জমা হয় এবং রক্ত জমে থাকার ফলেই অঙ্গটি শক্ত ও দৃঢ় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় এর দৈর্ঘ্য চার থেকে সাড়ে ছয় ইঞ্চি, ব্যাস দেড় ইঞ্চি

কি আর একটু বেশী। পুরুষাঙ্গ তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়, অগ্রভাগ, মধ্যভাগ আর অন্ত্যভাগ। অগ্রভাগ সবচেয়ে বেশী কোমল বলেই একটা আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে, নাম অগ্রচ্ছদা। অগ্রচ্ছদা সরিয়ে নিলেই রক্তিমাভ, অতিসংবেদনশীল লিঙ্গাগ্র উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। অন্ত্যভাগ হল সেই অংশটুকু যেখানে পুরুষাঙ্গ বস্তিপ্রদেশে মিশে গেছে, নাম লিঙ্গমূল। এই দুয়ের মাঝেই পুরুষাঙ্গের দেহ বা মধ্যভাগ।

গোটা অঙ্গের মধ্যে দিয়ে একটা নালীপথ উপরে উঠে গেছে, এর এক দিকে মূত্রনালীমুখ, লিঙ্গাগ্রের শেষ প্রান্তে। অন্যদিকে মূত্রস্থলী, তলপেটের মধ্যে। এই দুয়ের মধ্যে যে পথ চলে গেছে, সেটাই হল মূত্রনালী। এই পথ দিয়ে মূত্র বেরিয়ে আসে, আবার শুক্রকীটের আনাগোনা এই পথেই। অবস্থাভেদে একই পথ দিয়ে কখন বেরোয় মূত্র, কখনবা বীর্য। কিন্তু একই সময়ে দুটো একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে না। আর স্খলনের সময়, এই পথে চাপ দিয়ে বীর্যকে ঊর্ধ্বমুখী করা যায়। তখন কিন্তু এটা মূত্রনালী দিয়ে সোজা মূত্রস্থলীতে চলে যায়।

পুরুষাঙ্গের পিছনেই দেখি অণ্ডকোষ। এটা একটা আধার বিশেষ, এরই মধ্যে পাশাপাশি ঠাঁই করে নিয়েছে শুক্রাশয় বা অণ্ড দুটি। শুক্রাশয়ের কাজ হর্মোন তৈরী করা আর শুক্রাণু বা শুক্রকীট উৎপন্ন করা। এই হর্মোন থেকে যায়, রক্তে মিশে যায়, শুধু শুক্রকীটই বেরিয়ে আসে বীর্যের সঙ্গে। বীর্যপাতের অব্যবহিত পূর্বে এই শুক্রকীট ঊর্ধ্বমুখী হয়, শুক্রাণুনালী বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। এই নালীটি কিছু দূর উপরে উঠে পেটের মধ্যে চলে গেছে এবং মূত্রনালীতে মিশে গেছে। এই পথ ধরে শুক্রকীটও মূত্রনালীতে হাজির হয়। এই যাত্রাপথে শুক্রকীটগুলি, বীর্যস্থলী ও প্রষ্টেটগ্রন্থির ক্ষরণের সঙ্গে মিশে যায়, এবং এর সঙ্গে যোগ দেয় কাউপারগ্রন্থি ও লিটারগ্রন্থির ক্ষরণরাজি, সব

মিলেমিশে তৈরী হয় বীর্য এবং মিলন শেষে এটাই মূত্রনালীমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ১ থেকে ২ চা-চামচে আট কোটি থেকে বার কোটির মত শুক্রকীট থাকে। শুক্রকীট দেখতে অনেকটা ব্যাঙাচির মত। এর মাথা আছে, দেহ আছে, দেহ ও মাথার মধ্যে আছে গলা, আর আছে লেজ। এই লেজের সাহায্যেই শুক্রকীট চলে ফিরে বেড়াতে পারে, ছ' মিনিটে এক ইঞ্চি পথ অতিক্রম করতে পারে।
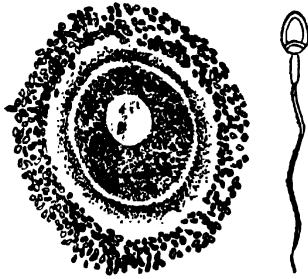
২নং ছবি—বহুল বর্ধিত ডিম্বাণু (বাঁদিকে) ও শুক্রকীট (ডান দিকে)

প্রজননের জন্যে এই আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গ-গুলির প্রয়োজনও কম নয়। প্রষ্টেটগ্রন্থি ও বীর্যস্থলীর ক্ষরণ ত' শুক্র-কীটের প্রাণ-সঞ্জীবনী, কাউপারগ্রন্থি ও লিটার গ্রন্থির ক্ষরণ মূত্রনালীর অম্লভাব নষ্ট করে ক্ষার-ভাবাপন্ন করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। অম্লীয় পরিবেশে শুক্রকীট বেঁচে থাকতে পারে না বলেই এদের প্রয়োজন এত বেশী। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, উত্তেজিত হলে লিঙ্গমুখে একরকম স্বচ্ছ আঠাল চটচটে পদার্থের আবির্ভাব ঘটে, এটা কিন্তু বীর্য নয়, এই গ্রন্থিদ্বয়েরই রসক্ষরণ। এর সঙ্গে কখন কখন শুক্রকীট যে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে তা প্রত্যেক জন্মনিয়ন্ত্রণেচ্ছু পুরুষের জেনে রাখা ভাল। কেননা এই ক্ষরণের জন্যে গর্ভাধান ঘটতে পারে। স্খলনের সময় প্রথম ফোঁটাটি যে একটু দূরে ছিটকে পড়ে এটাও মনে রাখা দরকার। আর স্ত্রীঅঙ্গের নিম্নভাগে, যোনিমুখে, এমন কি

বাইরে ভগদেশে স্খলিত হলেও শুক্রকীট বেয়ে বেয়ে উপরে চলে যেতে পারে, সেটাও। বীর্যপাতের পর সবটা বীর্য কিন্তু পুরুষাঙ্গ থেকে নিঃশেষে বেরিয়ে যায় না, খানিকক্ষণ পর্যন্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে এটাও ভুললে চলবে না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বেশীর ভাগই কিন্তু ভিতরে থাকে। জননের জন্যে প্রধানতম অঙ্গ দুটি হল জরায়ু আর ডিম্বাশয়। তলপেটের মধ্যে দুপাশে থাকে ডিম্বাশয় দুটি। দেখতে ছোট আখরোট বাদামের মত, এরই মধ্যে ছড়ানো রয়েছে অজস্র অপরিণত ডিম্বাণু। প্রতি মাসে একটি (কখননা দুটি) ডিম্বাণু পরিণত হয়ে ওঠে। তখন ডিম্বস্ফোটন হয়। ফলে ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে পেটের মধ্যে চলে আসে। তারপর সোজা ডিম্বাণুনালীতে চলে যায় (৫নং ছবি)।

জরায়ুর সঙ্গে ডিম্বাশয়ের যোগাযোগ ডিম্বাণুনালী মারফত, এই নালীপথের মধ্যে দিয়েই ডিম্বাণুর আনাগোনা। একটি প্রান্ত ডিম্বাশয়ের লাগোয়া, প্রান্তটি সূর্যমুখী ফুলের মত ডিম্বাশয়ের কাছে ছড়িয়ে থাকে, এর ভিতর দিয়েই ডিম্বাণুটি এই নালীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। অপর প্রান্তটির মুখ জরায়ু অভ্যন্তরে। শুক্রকীট এই মুখ দিয়ে নালীমধ্যে হাজির হয় আবার ডিম্বাণু এই পথ দিয়েই জরায়ুমধ্যে চলে আসে। বলা বাহুল্য, এই নালীপথের মধ্যেই শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর সাক্ষাৎ ঘটে।

জরায়ুমধ্যেই নিষিক্ত ডিম্বাণু বাসা বাঁধে। অনিষিক্ত ডিম্বাণুও জরায়ুতে আসে, তখন কিন্তু জরায়ুতে বাসা বাঁধে না, জরায়ুর ঝিল্লী-মোচনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত ডিম্বাণুও বেরিয়ে আসে, এটাই হল ঋতুস্রাব। জরায়ুটা দেখতে ছোট পেঁপের মত। পেঁপের বোঁটার সরু দিকটা হল জরায়ুগ্রীবা আর উপরের গোল অংশটুকু হল জরায়ুর দেহ, বোঁটাটা যেখানে লেগে থাকে সেটা হল জরায়ুমুখ। জরায়ুর

বেশীর ভাগ অংশই পেটের মধ্যে থাকে, হয় সামনের দিকে, পূর্বমুখী জরায়ু ; না হয় পিছনের দিকে, পশ্চাৎমুখী জরায়ু। কিছুটা থাকে যোনি মধ্যে, এটা জরায়ুগ্রীবার শেষাংশ। এরই মাঝখানে আছে জরায়ুমুখ। বাইরে থেকে ভিতরে যাওয়ার (শুক্রকীট) এবং ভিতর থেকে বাইরে আসার (মাসিক স্রাব কিংবা সন্তান) একমাত্র পথ এই জরায়ুমুখ।

জরায়ুগ্রীবার পরই শুরু হল যোনিপথ। এটাই রমণপথ এবং এখানেই বীর্য জমা হয়, আবার প্রসবপথও বটে। মূত্রপথ অবশ্য স্বতন্ত্র। উপরে জরায়ু, নীচে যোনিমুখ, এরই মধ্যে সীমিত যোনিপথ। ৩½—৪ ইঞ্চি লম্বা। সমস্ত পথ খাঁজে ভরা ও সম্প্রসারণশীল। যোনিপথ অম্লভাবাপন্ন। এই অম্লতাই স্ত্রীঅঙ্গ রক্ষা করে। এজন্যে স্ত্রীঅঙ্গে জন্মরোধক দ্রব্যাদি প্রয়োগের সময় এই স্বভাবজ অম্লতা রক্ষার কথা মনে রাখতে হবে।

এই পথের তিনটি সীমানা, অন্ত্যভাগ, মধ্যভাগ আর অগ্রভাগ। শায়িত অবস্থায় স্ত্রীঅঙ্গে কিছুদূর আঙ্গুল প্রবেশ করালেই হাতে একটা গোলমত নরম জিনিস ঠেকবে, এটাই জরায়ুগ্রীবার নিম্নাংশ আর এরই মাঝখানে একটা ছোট ফুটোও লক্ষ্য করবেন, এটা জরায়ুমুখ। জরায়ুর অবস্থাভেদে জরায়ুগ্রীবা ও জরায়ুমুখ ঊর্ধ্বমুখী কিংবা নিম্নমুখী হবে ; সন্তানপ্রসবের সংখ্যানুপাতে ছোট কিংবা বড় হবে। আর জরায়ুগ্রীবার সামনে ঊর্ধ্ব ফর্নিক্স, পিছনে নিম্ন ফর্নিক্স এবং দুপাশে দুটি পার্শ্বস্থ ফর্নিক্স—এই চারটি সঙ্কীর্ণ পরিসর জায়গাও হাতে ঠেকবে। যেখানে এদের সমাবেশ ঘটেছে, সে-অংশটুকু হল অন্ত্যভাগ। এই অন্ত্যভাগ অনেকটা চাঁদোয়ার উপরিভাগের মত, এরই আশ্রয়ে উদরা-ভ্যন্তর থেকে স্ত্রীঅঙ্গের পৃথকীকরণ সম্ভবপর হয়েছে। এজন্যে স্ত্রীঅঙ্গে কোন কিছু প্রয়োগ করলে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে চলে যাবার মত ভয়

নেই। আঙুলটি বের করে আনার সময় মধ্যপথে, উপরে ও নীচে, খাঁজকাটা যোনিগাত্রের স্পর্শ মিলবে, এটা হল মধ্যভাগ। সবশেষে, উপরের দেয়ালে, যোনিমুখের একটু উপরেই, একটা শক্ত মত জিনিস হাতে ঠেকবে, এটা পিউবিক অস্থি। এখানেই ডায়াফ্রামের একপ্রান্ত লেগে থাকে। নীচের এই অংশটুকু হল অগ্রভাগের সীমানা (৩নং ছবি দেখুন)।
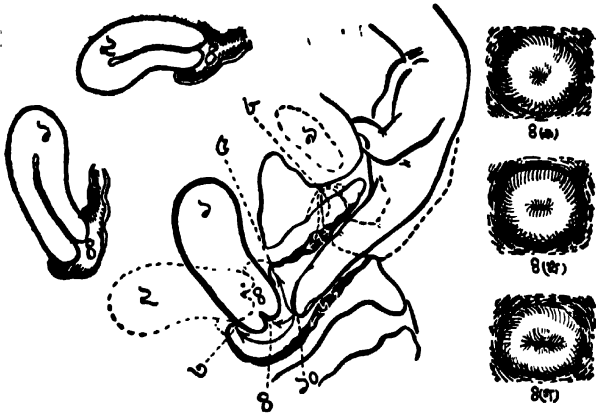
৩নং ছবি—জন্মরোধের জন্যে জ্ঞাতব্য শারীরস্থান

১। পূর্বমুখী জরায়ু ২। পশ্চাৎমুখী জরায়ু ৩। নিম্ন ফর্নিক্স ৪। জরায়ুমুখ (ক) নিঃগর্ভা নারীর (খ) একগর্ভা নারীর (গ) বহুগর্ভা নারীর ৫। উর্ধ্ব ফর্নিক্স ৬। নিম্ন যোনিগাত্র ৭। উর্ধ্ব যোনিগাত্র ৮। অঙ্গুলি সাহায্যে পিউবিক অস্থি অনুভব ৯। পিউবিক অস্থি ১০। জরায়ুমুখের সম্মুখদেশে অঙ্গুলিস্থাপন

যোনিপথের বাইরের অংশটুকু হল বহির্যোনি বা ভগদেশ। প্রথমেই নজরে পড়ে দুপাশে দুটো পুরু মাংসল পর্দা, বৃহদোষ্ঠ। এই

পর্দা সরালে আরও দুটো সূক্ষ্ম পর্দা, ক্ষুদ্রোষ্ঠ বেরিয়ে পড়বে। এই পর্দা চারটির কাজ হল মূত্রনালীমুখ ও যোনিমুখ ঢেকে রাখা এবং রক্ষা করা। ভিতরের সূক্ষ্ম পর্দা দুটো উপরে গিয়ে যেখানে মিশেছে সেখানে লুকিয়ে আছে একটি অতিক্ষুদ্র অঙ্গ। এটা ভগাঙ্কুর। পুরুষাঙ্গের অনুরূপ, তাই সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীল। এরই এক ইঞ্চি নীচে থাকে একটি নাতিক্ষুদ্র ছিদ্র, মূত্রনালীমুখ। শুধু মূত্র নির্গমনের

১। রতিশৈল (মন্‌স্‌ ভেনারিস) ২। ভগাঙ্কুরের অগ্রচ্ছদা। ৩। ভগাঙ্কুর ৪। ক্ষুদ্রোষ্ঠ ৫। বৃহদোষ্ঠ ৬। মূত্রনালীমুখ ৭। স্কিন গ্রন্থি ৮। যৌন আবরণী (সতীচ্ছদ) ৯। যোনিমুখ ১০। বার্থলিন গ্রন্থি

৪নং ছবি—বহির্যোনি

জন্যেই এর প্রয়োজন। এরই নীচে থাকে আর একটি নাতিবৃহৎ গোলাকার ছিদ্র, যোনিমুখ। এটা যোনিপথের প্রবেশদ্বার (৪নং ছবি)।

কুমারী অবস্থায় যোনিমুখ একটা পর্দা (সতীচ্ছদ) দিয়ে ঢাকা থাকে, এরই মধ্য দিয়ে মাসিক রক্ত বেরিয়ে আসে। একটা আঙ্গুল এর মধ্যে কিছুদূর চলে যেতে পারে, কোথাও পারে না। প্রথম মিলনের সময় পর্দাটি ছিঁড়ে যায়। বিয়ের আগে মুখ অপ্রশস্ত ও পথ অপ্রসারিত থাকে বলেই ডায়াফ্রাম্ পরানো যায় না, এজন্যে বিয়ের পর দুতিন মাস অপেক্ষা করতে হয়।

যোনিমুখের দুপাশে থাকে বার্থলিন গ্রন্থি ; স্কিন গ্রন্থি থাকে মূত্রনালীমুখের দুপাশে। এদেরই ক্ষরণে বহির্যোনি সিক্ত হয়ে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ সুগম করে দেয়। আর জরায়ুগ্রীবাস্থিত গ্রন্থিগুলির ক্ষরণে অন্তর্যোনি রসার্দ্র হয়ে ওঠে। পিচ্ছিলতা ছাড়াও এদের আরেকটি

মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সেটা হল যোনিপথের অম্লভাব সাময়িককালের জন্যে ক্ষারধর্মী করে তোলা।

শিশু কেমন করে জন্ম নেয়

মিলনকালে শুক্রাশয় ও এপিডিডিমিস থেকে শুক্রকীটগুলি নির্দিষ্ট পথ ধরে বীর্যস্থলীতে হাজির হয় (১ নং ছবি দেখুন)। চরম মুহূর্তে বীর্যরূপে বেরিয়ে এসে, স্ত্রীঅঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে জরায়ুমুখের সম্মুখদেশে কিংবা জরায়ুর আশে পাশে অজস্র শুক্রকীট জমায়েত হয় আর এখান থেকে জরায়ুমুখে অনবরত হানা দিতে থাকে। দিতে দিতে কতকগুলি ভাগ্যবান শুক্রকীট জরায়ুমুখ দিয়ে ভিতরে চলে যায়। জরায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করেই, তারা ছুটে চলে ডিম্বাণু-নালীর দিকে। এই নালীর শেষ প্রান্তে ডিম্বাণুর দেখা পেলেই গর্ভাধান ঘটবে (৫ নং ছবি দেখুন)। আর না পেলে, বৃথাই খুঁজে ফিরে মরা।

এখন দেখা যাক, ডিম্বাণু এই নালীপথে কি করে আসে। সাধারণত প্রত্যেক মাসে পরবর্তী স্রাবের ১৪ দিন আগে ডিম্বস্ফোটন ঘটে অর্থাৎ একটি করে পরিণত ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে আসে। বেরিয়েই, সোজা চলে যায় ডিম্বাণুনালীতে। পুরো নালীপথটি ভ্রমণ করতে এদের সময় লাগে ৪।৬ দিন। নালীভ্রমণের প্রথম দিনে, শুক্রকীটের দেখা পাওয়ার অর্থই হল গর্ভাধান। আর দেখা না হলে, ডিম্বাণু মনের দুঃখে জরায়ুগহ্বরে তলিয়ে যায় এবং কিছু দিনের মধ্যেই মাসিক স্রাবের সঙ্গে ঐ মৃত ডিম্বাণুটি বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা, মৃত ডিম্বাণুর জন্যে জরায়ুর শোকার্ত ক্রন্দনই হল মাসিক স্রাব।

নালীমধ্যে ডিম্বাণু ও শুক্রকীটের আসা যাওয়া একই সময়ে ঘটলে গর্ভাধান দেখা দেয়। নালীপথে প্রথম অঙ্কুর সৃষ্টি হয়। নবজাত অঙ্কুর

ধীরে ধীরে জরায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তারপর ছ'দিনের মধ্যেই জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হয়। ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত এটা জরায়ুমধ্যেই থাকে। এখানেই ক্ষুদ্র অঙ্কুর পল্লবিত হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই অঙ্কুর হয় ভ্রূণ আর ভ্রূণ রূপান্তরিত হয় শিশুতে।
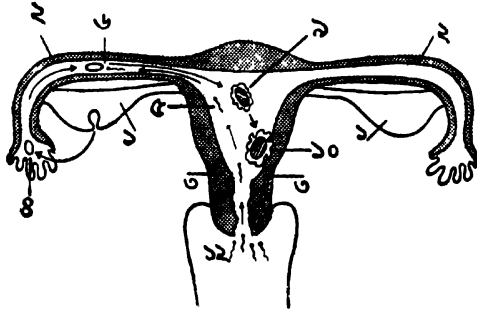
১। ডিম্বাশয় ২। ডিম্বাণুনালী ৩। জরায়ুগ্রীবা ৪। ডিম্বাণুনালীর শেষ প্রান্তে ডিম্বাণু ৫। জরায়ু অভ্যন্তরে শুক্রকীট ৬। শুক্রকীট কর্তৃক ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ ৯। জরায়ু অভ্যন্তরে নিষিক্ত ডিম্বাণু ১০। জরায়ুগাত্রে প্রোথিত নিষিক্ত ডিম্বাণু ১২। জরায়ুমুখের সম্মুখদেশে শুক্রকীট

৫নং ছবি—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর গতিপথ

এখন গর্ভাধানের মূলসূত্রগুলির উল্লেখ করব :

এক, উৎপাদন। সুস্থ শুক্রকীট ও পরিণত ডিম্বাণু তৈরী হওয়া চাই।

দুই, নির্গমন পথ। শুক্রাণুনালী দিয়ে শুক্রকীট বেরিয়ে আসবে, ডিম্বাণুও যথারীতি ডিম্বাণুনালীতে হাজির হবে।

তিন, স্বাভাবিক বীর্যনিষেক। নর-নারী মিলিত হবে, স্ত্রীঅঙ্গে
বীর্যপাত হবে এবং জরায়ুর আশেপাশে বীর্য জমা হবে।

চার, ডিম্বাণুনালীযাত্রা। বীর্যস্থিত শুক্রকীট জরায়ুমুখ দিয়ে
জরায়ুতে এবং জরায়ু থেকে ডিম্বাণুনালীতে হাজির হবে।

পাঁচ, নিষিক্তকরণ। শুক্রকীট ডিম্বাণু ভেদ করবে।

ছয়, জরায়ুগাত্রে প্রোথিতকরণ। নবজাত অঙ্কুর ডিম্বাণুনালী
থেকে জরায়ুতে আসবে এবং জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হবে।

কেমন করে গর্ভাধান স্থগিত থাকে

শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলন কিংবা জরায়ুগাত্রে প্রোথিতকরণ, যারাই বন্ধ করে তারাই হল জন্মনিরোধক। অতএব, উপরোক্ত প্রজনন পর্বের যে কোন স্তরে হস্তক্ষেপ করলেই, জন্মনিয়ন্ত্রণের দেখা মিলবে :

● উৎপাদন কেন্দ্রে হস্তক্ষেপ করেও গর্ভরোধ করা যায়। এক্ষেত্রে, তাপ, শৈত্য, হর্মোন প্রয়োগে ডিম্বাণু বা শুক্রকীটের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া যায়।

● নির্গমন পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে চিরতরে জন্মরোধের আশ্রয় নেওয়া হয়। এটা বন্ধ্যাকরণ।

● বীর্যনিষেকের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে গর্ভরোধের আশ্রয় নেয় কন্‌ডম্‌ ও অধিকাংশ স্বাভাবিক পদ্ধতিগুলি (খণ্ডিত সুরত, ব্যাহত সুরত, বহির্যোনি সঙ্গম, অঙ্গবিন্যাস ও অঙ্গচালনা)।

● ডিম্বাণুনালীযাত্রা স্থগিত রেখে দেয় এমন জন্মরোধক দ্রব্যাদিই দলে ভারী। জরায়ুমুখের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয় নানাবিধ স্ত্রীআবরণী, ডায়াফ্রাম্‌, চেক পেসারী ইত্যাদি। আর, জেলী, ট্যাবলেট, ডুশ প্রভৃতি রাসায়নিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগে স্ত্রীঅঙ্গে নিক্ষিপ্ত বীর্য মারা পড়ে বলেই শুক্রকীটের নালীযাত্রা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

● নিষিক্তকরণ দুরূহ করে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক-কালের। নানাবিধ ঔষধ সেবনে ডিম্বাণুকে দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়। ফলে, শুক্রকীট ডিম্বাণু ভেদ করতে পারে না।

● জরায়ুগাত্রে প্রোথিতকরণ অসম্ভব করেও কোন কোন জন্ম-রোধক দ্রব্যাদি গর্ভাধান ঠেকিয়ে রাখে। ডাঃ সান্যালের বড়ি, গ্রাফেনবার্গ রিং এইভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজ চালিয়ে নেয়।
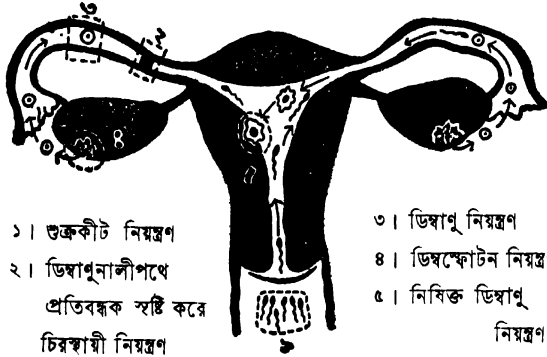
৬নং ছবি—চিত্রে জন্মকথা (ডানদিকে) ও জন্মরোধ (বাঁদিকে)

শ্রেণী বিভাগ

পদ্ধতির প্রকৃতি বা স্বরূপ অনুযায়ী এদের শ্রেণীবিভাগ করাটাই সবচেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত। আবার ব্যবহারকারী, পদ্ধতির সংখ্যা, স্থায়িত্ব, ক্ষতিহীনতা ও কার্যকারিতা অনুসারেও শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

● আবরণীমূলক পদ্ধতি—কোন না কোন আবরণী প্রয়োগ করে শুক্রকীটের অগ্রগতি রোধ করা যায়। পুরুষের জন্যে একমাত্র আবরণী

কন্‌ডম্। নারীর জন্যে অনেক রকমের আবরণী আছে, ডায়াফ্রাম্, সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্, স্পঞ্জ, ট্যাম্পন ইত্যাদি।

● রাসায়নিক পদ্ধতি—স্ত্রীঅঙ্গে শুক্রকীটধ্বংসী রাসায়নিক দ্রব্য (জেলী, ট্যাবলেট প্রভৃতি) প্রয়োগেও জন্মরোধ সম্ভব।

● সহভেষজ আবরণীমূলক পদ্ধতি—কোন রাসায়নিক দ্রব্য সহযোগে পুরুষ-আবরণী বা স্ত্রী-আবরণী প্রয়োগের সমর্থন প্রায় প্রত্যেক জন্মনিয়ন্ত্রণ-বিশারদই করে থাকেন। এতে সর্বাধিক গর্ভ-নিরাপত্তা পাওয়া যায়, তাই।

● অপারেশনমূলক পদ্ধতি—অপারেশন করেও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব, তবে চিরকালের জন্যে। এটা হল বন্ধ্যকরণ।

● জৈবিক পদ্ধতি—এক্সরে, তাপ, স্পার্মাটক্সিন্, ইঞ্জেকশন, হর্মোন প্রভৃতির আশ্রয়েও জন্মরোধ ঘটে। জীববিদ্যার সূত্রানুসারী বলেই, এটা জৈবিক পদ্ধতি।

● শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি—শারীরবৃত্তীয় সূত্র ধরেই এই পদ্ধতির উদ্ভব। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল তিথি-সহবাস আর অধিককাল শিশুকে স্তন্যদান।

● যান্ত্রিক পদ্ধতি—এতে জরায়ুমুখে বা জরায়ুমধ্যে কোন যন্ত্র-পাতি প্রয়োগ করা হয়, যেমন গ্রাফেনবার্গ রিং, সার্ভাইক্যাল্ ষ্টেম্।

● গার্হস্থ্য পদ্ধতি—ঘরে ঘরেই পাওয়া যায় এমন পদ্ধতি। নারিকেল তৈল, বস্ত্রখণ্ড, তুলো প্রভৃতি।

● আপৎকালীন পদ্ধতি—বিপদ আপদের সময় অবলম্বনীয় পদ্ধতিগুলি (ফেনায়িতকরণ, ধৌতকরণ প্রভৃতি) এই শ্রেণীভুক্ত।

● স্বাভাবিক পদ্ধতি—খণ্ডিত সুরত, তিথি-সহবাস, অঙ্গবিন্যাস ও অঙ্গচালনা প্রভৃতি পদ্ধতিতে কোন কিছু কৃত্রিম দ্রব্য প্রয়োগ করতে হয় না বলেই এরা স্বাভাবিক।

কেন এই নিয়ন্ত্রণ ?

জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দু'পক্ষেরই হয়ে অনেক যুক্তি ও তর্ক দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি আলোচনা করা যায়। কেন এই জন্মনিয়ন্ত্রণ তা নিয়ে একটা গোটা বই রচিত হতে পারে এবং হয়েছেও। আবার এটা যে স্বাভাবিক নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ, অতএব ক্ষতিকারক, দুর্নীতির সহায়ক এবং অতিমিলনের প্রশ্রয়দাতা ইত্যাদি বিরুদ্ধযুক্তির বেড়াজাল ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ছড়িয়েছেও। আর শেষোক্ত বিরুদ্ধযুক্তির অসারতা প্রমাণ করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়, সন্দেহাতীত-ভাবে সম্ভবপর। আমরা কিন্তু এই বাদানুবাদে যোগ দেব না। কেননা আজকের দিনে এটা যে চাই, এটা যে করতে হবে, এ মনোভাব ত' প্রায় সকলেরই। বিরুদ্ধযুক্তি ফলাও করে দেখালেই বা কে শুনছে! যে যুগে শুনত, সে যুগ ত' কবে কেটে গেছে। এ যুগে প্রায় সকলকেই ত' দেখি জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। তাই, প্রয়োগক্ষেত্রের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা, আশা করি, খুব বেশী অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১। **সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি**—সামাজিক কাঠামো এমনই বদলে গিয়েছে যে, নিয়ন্ত্রণ না থাকলে আজ আর চলে না (এমন কি আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও)। আর অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয়ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। একারণে অনেক দম্পতির কাছেই সন্তান মহার্ঘ্য, ব্যয়বহুল। মানুষের মত মানুষ করতে পারবে না এই দুশ্চিন্তায় বৃহৎ পরিবারের গৌরব আজ আর কেউ মাথা পেতে নিতে চায় না। তাই আজকের দিনে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই অধিকাংশ দম্পতি জন্মরোধের প্রয়াসী।

২। **স্বাস্থ্য**—স্বাস্থ্যগত কারণে ডাক্তারী যুক্তি। প্রথম দিকে এটাই ছিল একমাত্র ও প্রধানতম যুক্তি। এখন, পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এই সিংহাসনে বসেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, অর্থনৈতিক যুক্তি ডাক্তারী নীতি বহির্ভূত নয়। কেননা দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের মধ্যেই ত' শিশুমৃত্যু, অকালমৃত্যু, ব্যাধিগ্রস্ততার হার সব চেয়ে বেশী। আর দারিদ্র্য ও তরুণ-বয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ এই বৃহৎ পরিবারই।

এক সন্তানের পর আরেকটি খুব তাড়াতাড়ি যাতে না আসে, সেজন্যে নিয়ন্ত্রনের সমর্থন প্রতিটি ডাক্তারেই করে থাকেন। এটাই কিন্তু জন্মরোধের অন্যতম জোরালো যুক্তি, একে আশ্রয় করেই ত' এই আন্দোলনের জন্ম।

বছর যেতে না যেতেই আরেকটি শিশু জন্ম নিলে, শিশুমৃত্যুর হার সব চেয়ে বেশী হয়ে পড়ে। প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি উভয়েই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনটিই ভাল করে মায়ের যত্ন পায় না। প্রথমটির স্তন্যপান কাল কমে যায়। আর মায়ের স্বাস্থ্যও জোড়া লাগার সময় পায় না। একারণে, অতি অল্পকালের ব্যবধানে ঘন ঘন সন্তান প্রসবে মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে পড়ে। একটা উদাহরণ দিই। একজন স্বাস্থ্যবতী নারী অনায়াসে ছ' ছ'টি সন্তানের জননী হতে পারে। ছ' বছরে ছ'টি হলে, ভেঙ্গে পড়ে আর দু' তিন বছর বাদে বাদে হলে মা ও শিশু উভয়েই সমাজের শোভাবর্ধন করে। একারণে ২।৩ বছরের ব্যবধানে সন্তানের জন্ম হওয়া চাই। আর গর্ভপাতের পর তিন থেকে ছ' মাস পর্যন্ত গর্ভরোধ।

কোন অসুখবিসুখ থাকলে, এটা যে অবশ্য করণীয়, তা বোধ হয় না বলে দিলেও চলে। গর্ভাধানে বা প্রসবে মায়ের মৃত্যু হতে পারে কিংবা গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, এমনতরো ব্যাধিতে গর্ভ স্থগিত রাখাটাই চির বাঞ্ছনীয়। শিশুরও ক্ষতি বা অনিষ্ট হতে পারে এমন ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। হৃদ্‌রোগ, যক্ষা, নেফ্রাইটিস (কিডনীর রোগ), ডায়াবিটিস্ (বহুমূত্র), ব্লাডপ্রেসার (রক্তের চাপবৃদ্ধি), রক্তহীনতা,

মানসিক ব্যাধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জন্মরোধ অপরিহার্য। বহুপ্রসবিনী, অতিদুর্বল এবং সদ্য অপারেশন করা হয়েছে এমন নারীরও গর্ভরোধ যে প্রয়োজনীয় তা বলাই বাহুল্য। বংশগত ব্যাধি ও রতিজ ব্যাধিতেও এর মূল্য অনেক। সুপ্রজননবিদ্যার খাতিরেও এর সমর্থক আছেন।

গর্ভাধান না গর্ভবন্ধ, এ বিচারের ভার ডাক্তারের নয়, দম্পতিরই। শুধু দু'টি ক্ষেত্রে, সন্তান জন্মের পর আর অসুখবিসুখে, ডাক্তারের যা একটু বলবার আছে।

৩। সেক্স বা যৌনতা—শান্তিপূর্ণ যৌন-জীবনের জন্যেও জন্ম-রোধের প্রয়োজন আছে। বিয়ের পর কিছু সময় দেওয়া উচিত, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বা পারস্পরিক সঙ্গতিবিধানের জন্যে। তাই এক বছরের মধ্যে কোন ছেলেপিলে না আসাই ভাল। এরপর সন্তানের জন্ম দিতে কোন বাধা নেই। তারপর প্রতিটি সন্তান জন্মের মধ্যে কিছু সময়ের (কমপক্ষে দেড় বছর, আর তিন বছরের বেশী নয়) ব্যবধান থাকা উচিত। তা না হলে যৌনজীবন কণ্টকিত হয়ে উঠবে। গর্ভাতঙ্কে সমস্ত তৃপ্তি মাঠে মারা যাবে। শুধু একারণে, অনেক দম্পতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিলিত হওয়ার অবকাশ পায় না, এমন কি রতি-জড়তা, অঙ্গশিথিলতা প্রভৃতি যৌন দুর্ঘটনাও দেখা দিতে পারে।

৪। পরিবার পরিকল্পনা—আর শেষ বয়সে (৪০-৫০) কিংবা মনের মত সন্তানাদি (৩-৪টি) পেয়ে গেলে, গর্ভনিয়ন্ত্রণ ত' অপরিহার্য।

৫। পৌরস্বাস্থ্য—জন্মরোধের আশ্রয়ে বেশী বয়সে বিয়ের রেওয়াজটা কমে যেতে পারে। এতে গোষ্ঠীর ও ব্যক্তির উভয়েরই উপকার হবে। বেশ্যারা প্রশ্রয় পাবে না, রতিজব্যাধিও কমে আসবে। অবাঞ্ছিত সন্তান দেখা দেবে না। ফলে অবৈধ গর্ভ-পাতও কমে যাবে।

৬। **জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ**—সমাজ, অর্থ, স্বাস্থ্য, যৌনতা, সবই মানুষের জীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। তাই, জন্মরোধের সমস্যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত। ব্যক্তির সমাবেশে রাষ্ট্র, তাই এ সমস্যা কতকটা রাষ্ট্রগতও বটে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, প্রতি যুগে প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্যালথাসই প্রথম দেখিয়ে দেন, প্রজননের রাশ চেপে না ধরলে পৃথিবীর রসদে, খাদ্যবস্তুতে, টান পড়বে। তখনই নানাবিধ অশান্তি দেখা দেবে। অর্থাৎ অতিপ্রজনই দুঃখের মূল কারণ।

এটা কিন্তু সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেয়নি। এক পণ্ডিতের সঙ্গে আর এক পণ্ডিতের চিন্তাধারা মেলে না, এক রাষ্ট্রের মত অপর রাষ্ট্রে খাপ খায় না। কোন রাষ্ট্র সংখ্যা কমাও, ফসল বাড়াও বলে চেঁচাচ্ছে। অন্য রাষ্ট্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে শঙ্কিত। আবার আর এক রাষ্ট্র অতিপ্রজনের জন্যে বাহবা দিচ্ছে, পুরস্কৃত করছে।

একদল পণ্ডিত পৃথিবীর জনসংখ্যা হু-হু করে (প্রতি বছরে সাড়ে পাঁচ কোটির মত) বেড়ে চলেছে বলে বিষণ্ণ। আর একদল বলছে : মাভৈঃ, বিপুলা পৃথ্বী, বিপুলতর তার খাদ্যসম্ভার, কোনদিনই এ খাদ্য-ভাণ্ডারে ঘাটতি হবে না। বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্যশস্যের পরিমাণ অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অর্থাৎ যতই লোক আসুক না কেন পৃথিবী এদের চাহিদা মেটাতে পারবে।

১৯৫১ সালের আদমশুমারীতে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬১,৮২,০০,০০। অর্থাৎ বিগত দশ বছরে (১৯৪১-১৯৫১) ৪৩,০০,০০,০০ জন বেড়ে গেছে। বর্তমানে (১৯৬১) ভারতের জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ। এখন এই হারে, অর্থাৎ প্রতি বছরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ করে যদি বাড়তে থাকে ভবিষ্যতে ভারতের অবস্থাটা যে সুখকর হবে না তা সহজেই অনুমেয়।

রাষ্ট্র যাই বলুক না কেন, এটা যে মূলত ব্যক্তিগত সমস্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনার নিজের জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ কতটা প্রয়োজনীয় সে বিচারের ভার আপনারই।

কোথায় নয়

এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে সন্তানের জন্ম দিতে কালবিলম্ব করাটা অনুচিত। শুধু তাই নয়, কখন কখন ক্ষতির কারণও হতে পারে। যেমন:

বেশী বয়সে—ত্রিশের কোঠায় অহেতুক গর্ভাধান স্থগিত রাখা নারীর পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, যতই বয়স বাড়বে (বিশেষ করে ত্রিশের পর) গর্ভসম্ভাবনা ততই কমে আসবে। শুধু তাই নয়, প্রসবকালীন বিপদ আপদও ততই ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকবে।

অতএব, বেশী বয়সে বিয়ে হলে দ্রুতলয়ে চলতে হবে অর্থাৎ যত শীঘ্র সন্তান আসে তার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। তেমনি খুব কম বয়সে বিবাহিত হলে উল্টো চালে অর্থাৎ বিলম্বিত লয়ে চলা যায়।

তিন বছরের বেশী নয়—একটি সন্তানের পর তিন বছরের বেশী গর্ভ-বিশ্রাম বাঞ্ছনীয় নয়। কোলের শিশুটি সঙ্গী পাবে না, তাই। আর মায়েরও মন হাঁপিয়ে উঠবে। এও একটি কারণ বটে।

বন্ধ্যাত্বের সন্দেহে—স্বামী, স্ত্রী বা উভয়েরই প্রজনন-ক্ষমতায় কোন কারণে কোন সন্দেহ থাকলে, অকারণে গর্ভবিরতি আদৌ যুক্তি-যুক্ত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকরও বটে। মাসিক স্রাবের গোলযোগ, অল্পস্রাব, অনেক দিনের ব্যবধানে অনিয়মিত স্রাব, স্ত্রী-অঙ্গের অপুষ্টি, রতিজব্যাধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে, গর্ভবন্ধের চেষ্টা না করে গর্ভাধানের জন্যে সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

সু-প্রজনার্থে—উচ্চশিক্ষা, মার্জিত রুচি, দীপ্ত বুদ্ধি, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, সুন্দর বংশগতি আর প্রচুর অর্থ যাঁদের আছে, এমন দম্পতি যে অতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী হবেন না, এটাই আমরা আশা করি। এঁদের, ২।৩টি সন্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় বরং ৫।৬টি গৌরবোজ্জ্বল সন্তানের জনক-জননী হওয়াটা যে অনেক বেশী গৌরবের তা এঁদের বোঝা উচিত।

পদ্ধতি নির্বাচন

সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক স্বচ্ছলতা, ধর্ম, শিক্ষা, বুদ্ধি, বয়স, সন্তান-সংখ্যা, পূর্ব-স্মৃতি, দায়িত্ববোধ, যৌন-স্বার্থ, জন্মনিয়ন্ত্রণে আস্থা, জন্মনিয়ন্ত্রণের তাগিদ কি এবং এটা কতটুকু জরুরী—এর প্রত্যেকটিই নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং এই প্রভাবের ফলেই নর-নারীর পদ্ধতি নির্বাচনে এত পার্থক্য। একারণে, একই পদ্ধতি সকলের জন্যে নয়। এক দম্পতির ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য, সেটি অপর দম্পতির ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। এ কথা ক্লিনিকের ডাক্তারের মনে রাখা উচিত এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি দম্পতির জন্যে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করে দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চিকিৎসক নির্দেশিত পন্থা সবদিক থেকেই ভাল।

সোজা কথায়, পদ্ধতি নির্বাচনের একটি বিশেষ ধারা আছে। এর মূলসূত্র প্রধানত চারটি :

এক, নির্ভরযোগ্য হবে। অর্থাৎ ৮০% থেকে ৯০% এর অধিক ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। বন্ধ্যাকরণের কাছাকাছি সাফল্য-লাভের (৯৯.৯%) জন্যে যে কোন দ্বৈত বা ত্রি-পন্থার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

দুই, সর্বতোভাবে ক্ষতিশূন্য হবে। পদ্ধতি প্রয়োগে কারুরই কোন ক্ষতি হবে না। না স্বামীর, না স্ত্রীর। আবার পদ্ধতি পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভ-সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তিন, যৌনগ্রাহ্য হবে। পদ্ধতি প্রয়োগে রতিতৃপ্তি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে না। স্বামীরও নয়, স্ত্রীরও নয়। উভয়ের যৌনতার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে পদ্ধতিটি যৌনপ্রদ হবে।

চার, স্ত্রী-নির্ভর হবে। গর্ভ-ভার ও প্রসবযাতনা স্ত্রীকেই সহ্য করতে হয়। একারণে এরা খুবই হিসেবী অর্থাৎ প্রতিটি মিলন-পূর্বে পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োগবিধির একচুল এদিক ওদিক হতে দেয় না। এ তুলনায় পুরুষেরা খুবই বেহিসেবী। অর্থাৎ কারণে অকারণে বিপদের ঝুঁকি নেয়, পদ্ধতি প্রয়োগে প্রায়ই গাফিলতি করে, প্রয়োগবিধিতে ভুলচুক করে। একারণে, গর্ভরোধের চাবিকাঠি স্ত্রীর হাতে থাকাই চির বাঞ্ছনীয়। এটা একান্তই অসম্ভব হলে পুরুষ-প্রধান পদ্ধতি বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় কি!

এই নির্দেশনামা অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচনে অগ্রসর হলে পুরুষের জন্যে পাব কন্‌ডম্‌, খণ্ডিত সুরত এবং বন্ধ্যাকরণ অপারেশন। আর নারীর জন্যে পাব তিথি-সহবাস; ডায়াফ্রাম্‌, সার্ভাইক্যাল্‌ ক্যাপ্‌ প্রভৃতি স্ত্রী আবরণী; জেলী, ট্যাবলেট প্রভৃতি রাসায়নিক পদ্ধতি এবং বন্ধ্যাকরণ অপারেশন।

আদর্শ পদ্ধতি

আদর্শ পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি যার সব গুণই আছে, যা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্বপাত্রে প্রয়োগ করা যায়। এর গুণাবলী হল:

- বিজ্ঞানসম্মত হবে।
- কার্যকারিতায় অদ্বিতীয় হবে।

● প্রয়োগবিধি জলের মত সহজ হবে। প্রয়োগপর্বের জন্যে কোন বিশেষ বুদ্ধি বা শিক্ষার প্রয়োজন হবে না।

● সর্বতোভাবে যৌনগ্রাহ্য হবে। রতিক্রিয়ার স্বাভাবিকতা কোথাও নষ্ট হবে না অর্থাৎ অনুভূতি পুরোপুরি সতেজ থাকবে, তৃপ্তিও থাকবে ষোল আনা, কামেচ্ছায় কোন ভাটা পড়বে না এবং ইচ্ছা-মাত্রই মিলিত হওয়া যাবে।

● প্রাপ্তিসুলভ হবে, সস্তা হবে। ফলে, সকল দেশের সকল লোকেই ব্যবহার করতে পারবে।

● সর্বতোভাবে ক্ষতিশূন্য হবে। কি অল্পকাল, কি দীর্ঘকাল, যে সময়ের জন্যেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, কোন অনিষ্ট হবে না।

● জনগণের উপযোগী হবে। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, ব্যক্তিগত ও অঙ্গগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন, সর্বসাধারণের জন্যে উপযোগী হবে।

এই যদি আদর্শ পদ্ধতির নমুনা হয়, প্রচলিত পদ্ধতিগুলির কোনটাই আদর্শ নয়। আদর্শসুলভ গুণাবলী সব চেয়ে বেশী আছে সেবনীয় ঔষধের। দুঃখের বিষয় এটা এখনও গবেষণাধীন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষতিকারক নয়

জন্মনিয়ন্ত্রণে ক্ষতি হতে পারে, এ রকম একটা ধারণা দেখি অনেকেরই আছে। সুদীর্ঘকাল প্রয়োগে দেহের, মনের কিংবা যৌনাঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, প্রজনন ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে আর প্রজনন ক্ষমতা অব্যাহত থাকলেও বিকলাঙ্গ বা ত্রুটিযুক্ত সন্তান জন্ম নিতে পারে, বিশেষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও কোন রকমে গর্ভ হলে—এবংবিধ সংশয় অনেকেই চিন্তিত করে তোলে। এই সংশয় কিন্তু অমূলক। কেননা উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আদৌ ক্ষতিকারক নয়। প্রয়োগবিহীন ও প্রয়োগ-সাপেক্ষ, উভয় ক্ষেত্রেই।

পৃথিবীর সমস্ত জন্মনিরোধক সংস্থা, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ্যাসোসিয়েশন ও আমেরিকার প্ল্যান্‌ড পেরেণ্ট-হুড্‌ ফেডারেশন একবাক্যে স্বীকার করেছেন : উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি প্রয়োগে দেহ, মন, যৌনাঙ্গ কোনটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যৌনতা অটুট থাকে। প্রজননক্ষমতাও অক্ষত থাকে অর্থাৎ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার কিছুকাল পরেই গর্ভাধান দেখা দেয়। নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ করেও গর্ভ হলে গর্ভজাত সন্তান সুস্থ ও সবল থাকে।

তা হলে স্পষ্টই বোঝা গেল যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষতিকারক নয়।

তবে যে পদ্ধতি আপনাকে সাজে না, সেটা নিয়ে মাতামাতি করলে, একটু আধটু ক্ষতি হওয়াটা বিচিত্র নয়। অর্থাৎ অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে, কিংবা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে ক্ষতি হতে পারে। তাই, অপরাধ পদ্ধতির নয়, আপনার।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। দেহ ও মনের কথা না শুনে, জোর করে দিনের পর দিন কন্‌ডম্‌ কিংবা খণ্ডিত সুরত প্রয়োগ করলে ক্ষতি হতে পারে। তেমনি অত্যধিক সাদা স্রাব নিয়ে, সার্ভাইক্যাল্‌ ক্যাপ্‌ বা জেলী ব্যবহার করলে।

তাই বলি, অভিজ্ঞ ডাক্তার বা ক্লিনিক নির্দেশিত পন্থা ব্যবহার করুন, আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। একান্তই অসম্ভব হলে, কোন ভাল বই-পত্র ঘেঁটে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। আর বিন্দুমাত্র অসুবিধা দেখা দিলে কিংবা ক্ষতির চিহ্ন প্রকাশ পেলে, অন্য পদ্ধতি নির্বাচন কিংবা ডাক্তারের পরামর্শ শতগুণে শ্রেয়।

কতটুকু নির্ভরযোগ্য ?

জন্মনিয়ন্ত্রণে যে কিছু হয় না, এ রকম ধারণা অনেকেরই দেখি। এটা ভুল, কেননা সুনির্বাচিত পদ্ধতি সঠিক উপায়ে সু-নিষ্ঠার সঙ্গে

প্রয়োগ করলে সাফল্যলাভ যে আসবেই তা সুনিশ্চিত। এতৎসত্ত্বেও কখন কখন ব্যর্থতা দেখা দিতে পারে। এই ব্যর্থতা মূলত পদ্ধতিগত কারণে। যন্ত্রপাতি যতই সুন্দর, যতই সার্থক হোক না কেন, মাঝে মাঝে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিতে পারে। তেমনি জন্মরোধের ক্ষেত্রেও। তাই, সাময়িক পদ্ধতির কোনটাই শতকরা শতটি ক্ষেত্রে অব্যর্থ নয়, এক আধটি ক্ষেত্রে (০·১%—২%) ব্যর্থতা দেখা দেবেই। এই অনিবার্যতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও যখন অবশ্যম্ভাবী, জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও মেনে নিতে হবে বৈকি !

আবার, দম্পতিগত কারণেও ব্যর্থতা দেখা দিতে পারে, এটার প্রাচুর্যই কিন্তু বেশী। অর্থাৎ যত না পদ্ধতিগত কারণে ব্যর্থতা তার চেয়ে প্রায় শতগুণে বেশী এই দম্পতিগত ব্যর্থতা। ১০০ জন দম্পতি যদি ব্যর্থ হন, তাদের মধ্যে ৯০ থেকে ৯৯ জন নিজেদের ত্রুটির জন্যে ব্যর্থ হন আর বাকী ১ থেকে ১০ জন পদ্ধতিগত কারণে।

এই ব্যর্থতার জন্যে পদ্ধতিটির উৎস, নির্বাচন, প্রয়োগ ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সবই দায়ী হতে পারে। হয়ত একারণেই মারী ষ্টোপস্ দুঃখ করে বলেছেন—১০০% সতর্কতার বিনিময়ে ১০০% নিশ্চিন্ততা পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা চুপিসারেই সেরে নিতে দেখা যায়। ডাক্তার বা ক্লিনিকের কাছে পারতপক্ষে কেউ যায় না। বন্ধুর মুখে শুনে, দোকানদারের কাছে জেনে কিংবা কোন বইটই পড়ে নিজেরাই মাতব্বরী করতে যায়। ফলে যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ ব্যর্থ হয়। একটি উদাহরণ দিই : প্রায়ই দোকানদারের কথামত ডায়াফ্রাম্ বা সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপের মাপ ঠিক করে নিতে দেখি। নারীর সন্তানসংখ্যা ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী এরা একটা মাপ বলে দেয়। আর দম্পতিকেও দেখি এই ক্যাপ্ ব্যবহার করতে এবং দুদিন পরেই

ব্যর্থ হতে। তাই বলি, নিজে নিজেই কাজ চালিয়ে নেব, এ মনোভাব ত্যাগ করুন। হয় নিজে ভাল করে জানুন, না হয় যাঁরা জানেন (ডাক্তার, ক্লিনিক) তাঁদের কাছে শিখুন। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, জন্মরোধেও কাজ হয়।

সবশেষে **বিভিন্ন জন্মরোধক পদ্ধতির সাফল্যহারের** উল্লেখ করব :

পদ্ধতি	সাফল্যহার
বন্ধ্যকরণ অপারেশন	১০০%
ডায়াফ্রাম্ + নিক্ষেপকযন্ত্রযোগে পূর্ণ মাত্রার জেলী	প্রায় ১০০%
সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ + „ „ „ „	প্রায় ১০০%
কন্‌ডম্ + „ „ „ „	প্রায় ১০০%
জেলীসিক্ত ডায়াফ্রাম্	৯৮%
„ সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ	৯৮%
„ কন্‌ডম্	৯৮%
শুধু কন্‌ডম্	৭০%—৯০%
বিশেষ ধরনের জেলী (কোরোমেক্স, প্রিসেপ্টিন্ ইত্যাদি)	৯০%
অন্যান্য জেলী, ক্রীম, পেষ্ট	৭০%—৯০% (গড়ে ৮০%এর উপরে)
ট্যাবলেট, সাপোজিটারী	৭০%—৯০% („ „ „ „)
ডুশ	১৬%—৭০%
খণ্ডিত সুরত	৩৫%—৮০%
রাসায়নিক সহযোগে স্পঞ্জ	৫৫%—৯৫%

স্বাভাবিক পদ্ধতি

সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ দু'ধরনের—কৃত্রিম পদ্ধতির আশ্রয়ে আর স্বাভাবিক উপায়ে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে কোন আবরণী, কোন রাসায়নিক দ্রব্য, কোন যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কোন কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হয় না বলেই, এটা পুরোদস্তুর স্বাভাবিক।

এত স্বাভাবিক যে ব্যবহারকারীরা এগুলিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে গণ্যই করতে চান না। যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, এরা গর্ভনিয়ন্ত্রণের উপায় বিশেষ, তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হতে বাধ্য।

জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে স্বাভাবিক জন্মনিয়ামক পদ্ধতিগুলির ক্রমপর্যায় হল :

১। খণ্ডিত সুরত
২। তিথি-সহবাস
৩। অধিককাল শিশুকে স্তন্যদান
৪। বহির্যোনি সঙ্গম
৫। অঙ্গবিন্যাস ও অঙ্গচালনা
৬। ব্রহ্মচর্য
৭। রাগমোচন বিরতি
৮। ব্যবহিত সুরত
৯। ঊর্ধ্বরেতঃ সঙ্গম

খণ্ডিত সুরত

কি ও কেন ?—বীর্যস্খলনের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর বিযুক্ত হওয়ার নামই 'খণ্ডিত সুরত'। যথারীতি শৃঙ্গার শেষে স্বাভাবিক-

ভাবেই নর-নারী মিলিত হয় এবং শেষ চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার একটু আগেই পুরুষ নিজ অঙ্গ উন্মুক্ত করেনেয়। ফলে বীর্যপাত হয় বাইরে। স্ত্রীঅঙ্গে বীর্যপাত ঘটে না বলেই, গর্ভাধান স্থগিত থাকে।

সুবিধা ও অসুবিধা—শর্তহীন যৌনসুখ আর গর্ভরোধের প্রচুর সম্ভাবনা, এই দ্বিবিধ আকর্ষণের জন্যেই খণ্ডিত সুরত এত চিত্তজয়ী। কিন্তু, মাত্র দুটি কারণে আদর্শস্থানীয় সমাদর পেল না। প্রথমটি হল বিযুক্তিকরণের সময় কষ্টকর অনুভূতি। দ্বিতীয়টি, উচ্চ ব্যর্থতা হার।

প্রয়োগক্ষেত্র—উপরোক্ত ত্রুটি দুটির জন্যেই খণ্ডিত সুরত সর্বজন-গ্রাহ্য নয়। তা হলেও, ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন আপৎকালে, এটাই একমাত্র পথ হতে পারে। আর অন্য কোন পদ্ধতি মনোমত না হলে, বাধ্য হয়েই খণ্ডিত সুরতে আস্থা স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ দম্পতিদের ধাতে সইলে এবং এতে অনুরক্ত হলে এ পদ্ধতির অনুমোদনে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কতকগুলি শর্ত আছে—

● স্বামীকে খণ্ডিত সুরতের যোগ্য পাত্র হতে হবে। অর্থাৎ উদ্বেগবিহীন রতিসুখ, সন্দেহাতীত রতিস্থায়িত্ব ও স্ত্রীর পূর্ণ কামতৃপ্তি চাইই।

● স্খলনের আধ মিনিট আগে থাকতেই অঙ্গ প্রত্যাহার এবং যোনিমুখ থেকে বেশ খানিকটা দূরে পূর্ণ বীর্যপাত করতে হবে।

● আর স্ত্রীঅঙ্গে কিছুটা জেলী (ট্যাবলেট নয়) প্রয়োগ করতে হবে। প্রাক্‌স্খলন উত্তেজনাক্ষরণে কখন কখন শুক্রকীটের আবির্ভাব হতে পারে, তাই।

● পুনরায় মিলিত হলে, মূত্রত্যাগ ও ধৌতকরণ অবশ্য করণীয়।

এটা কি ক্ষতিকর ?—অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এটা ক্ষতিকর ; যৌনদুর্ঘটনা, মানসিক অসুস্থতা, আভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গের ক্ষতি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখা দিতে পারে। আমরা কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক

ক্ষেত্রেই ক্ষতি হতে দেখেছি : পুরুষের অকালস্খলন, লিঙ্গ-শিথিলতা ; নারীর রতিজড়তা বা কামশীতলতা, এমন কি হিষ্টিরিয়াও। অবশ্য প্রত্যেক মাসে ঋতুস্রাব হওয়ার আগে গর্ভোৎকণ্ঠাজনিত উদ্বেগ বা অস্থিরতা এবং যৌন-অতৃপ্তির দরুন মানসিক অশান্তি অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি। বলাই বাহুল্য, পদ্ধতি পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গগুলি বিদায় নিয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের কাছে খণ্ডিত সুরত মারাত্মক নয়, মুষ্টিমেয় গোটাকতক ক্ষেত্রে কুফল দেখা গেলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই কোন ক্ষতি হয় না। যদি কোন ক্ষতি হয় সেটা হবে নার্ভতন্ত্রের, দেহের নয়। তাছাড়া ক্ষতি কোথায় হতে পারে তা জানি। এ জাতীয় নিষিদ্ধক্ষেত্রে খণ্ডিত সুরত বিষবৎ পরিত্যাজ্য। শুধু তাই নয়, উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্রেও কোন অশুভ উপসর্গের ইঙ্গিত পেলেই এটা বন্ধ করতে হবে।

খণ্ডিত সুরতের কুফল সম্বন্ধে সব পণ্ডিত কিন্তু একমত নয়। কেননা, যে পরিমাণে পদ্ধতিটি সর্বজনপ্রিয় সে তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত দম্পতির সংখ্যা বিরল। যদি ক্ষতিকর হত তা হলে ব্যবহারকারীর সংখ্যানুপাতে এই ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিল। তাই যদি না হয়, খণ্ডিত সুরত কেমন করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর হবে বলুন ? ঠিক এ কথাই বলেছেন ডাঃ হ্যাভলক এলিস, ডাঃ আর. এল. ডিকিনসন এবং ডাঃ কেনেথ ওয়াকার।

আমাদের মতামতও ঠিক তাই। স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষেরই ধাতে সইলে, খণ্ডিত সুরতে কোন কুফল, কোন ক্ষতি হয় না।

নির্ভরযোগ্যতা—এটা সত্য যে, কেউ কেউ এর আশ্রয়ে গর্ভ-নিয়ন্ত্রণে সফলকাম হয়েছেন। তা হলেও অধিকাংশ দম্পতি ব্যর্থ হয়েছেন, দু'দিন আগে, না হয় দু'দিন পরে। সাফল্যলাভ (৩৫%—৮০%) এত বেশী অনিশ্চিত বলেই, একক পদ্ধতি হিসেবে খণ্ডিত

সুরতের সমাদর নেই। কিন্তু, অন্য কোন পদ্ধতি যেমন, জেলী সহযোগে কিংবা তিথি-সহবাসের (উর্বরকালে রতিবিরতি এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদকালে খণ্ডিত সুরত) আশ্রয়ে খণ্ডিত সুরত বেশ নির্ভরযোগ্য।

তিথি-সহবাস

কি ও কেন?—নারীর প্রতিটি মাসিক চক্রে থাকে দু'টি ছন্দ—উর্বরকাল আর অনুর্বরকালের জোয়ার ভাটা। এই উর্বরকাল বাদ দিয়ে বাকী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ (অনুর্বর) দিনগুলিতে মিলিত হতে হয় বলেই এর নাম 'নিরাপদকালীন সহবাস' অথবা 'সেফ পিরিয়ড'। এ ভাবে ছন্দ দু'টিকে জন্মরোধের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করা হয় বলেই একে 'রিদম্ মেথড' অথবা 'ছন্দায়িত পদ্ধতি'ও বলা যায়। আর উর্বরকাল নির্ধারণের জন্যে ক্যালেণ্ডার ঘাটতে হবে তাই এর অপর একটি নাম হল 'তিথি-সহবাস'।

এই স্বাভাবিক পদ্ধতিটির মূলমন্ত্র হল নারীর উর্বরকালে রতি-বিরতি আর বন্ধ্যাকালে রতিবিহার। উর্বরকালে ডিম্বস্ফোটন ঘটে, একারণে এসময়ে মিলিত হলে গর্ভ-সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। অন্য সময়ের মিলনে শুক্রকীট থাকলেও, হয় ডিম্বাণু গরহাজির থাকে, না হয় ডিম্বাণুর প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। তাই অনুর্বরকালে গর্ভ-সম্ভাবনা কম থাকে। অতএব তিথি-সহবাসের মূলসূত্রগুলির সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে ডিম্বস্ফোটন, ডিম্বাণু ও শুক্রকীট সম্বন্ধে আলোচনা করতেই হবে।

ডিম্বস্ফোটন—১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী গবেষক ডাক্তার ওজিনোই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, মাসিকের ১২ থেকে ১৬ দিন আগে ডিম্বস্ফোটন হবেই হবে। তারপর, ইউরোপীয়

ডাক্তার নাউস্ এই মতবাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। তাঁর গবেষণালব্ধ মতটি হল—পরবর্তী স্রাব শুরু হওয়ার ১৫ দিন আগে ডিম্বস্ফোটন ঘটে থাকে। এটা ওজিনো-নাউসের মতবাদ, সংক্ষেপে ও-কে-মতবাদ নামেই প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

এর পর বহু গবেষক, বহু বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে কাজ করেছেন। কেউ সমর্থন করেছেন, কেউ করেননি। তাছাড়া ডিম্বস্ফোটন সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্কের অবকাশও আছে। তবে এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেছে যে :

● সাধারণত, প্রতিটি মাসিক চক্রে ডিম্বস্ফোটন হয় এবং একবারই হয় (মাসিক স্রাব যে-দিন শুরু হয় সে-দিন থেকে পরবর্তী স্রাবের শুরু পর্যন্ত দিনগুলির সমষ্টিগত নাম হল মাসিক চক্র)।

● অনেকেরই ধারণা দুই স্রাবের মাঝামাঝি সময়ে (অর্থাৎ স্রাবের ১৪।১৫ দিন পরে) ডিম্বস্ফোটন হয়। এই মত, মাসিক স্রাবের পর থেকেই এঁরা দিন গুনতে শুরু করেন। দশ দিন কি বার দিন পর থেকে এঁদের বিপদের দিন শুরু আর তার পর ছ' সাত দিন গত হলেই মিলনের শুভ দিনগুলি ফিরে আসে। এতে অধিকাংশই বিফল মনোরথ হন। কেননা, ডিম্বস্ফোটন-কাল মাসিক চক্রের মেয়াদের মুখাপেক্ষী এবং এই একই কারণে প্রতিটি মাসিক চক্রে একই সময়ে ডিম্বস্ফোটন হয় না। অতএব, বিগত স্রাবের তারিখ (যেটা আমরা জানি) থেকে ডিম্বস্ফোটন-কালের হিসেব আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়।

● সাধারণত, পরবর্তী স্রাবের ১৪ দিন আগে ডিম্বস্ফোটন ঘটে থাকে অর্থাৎ ডিম্বস্ফোটন হওয়ার আগে যত খুশি ব্যবধান থাকুক না কেন, ডিম্বস্ফোটনের ১৪ দিন পরে মাসিক স্রাব যে হবেই হবে তা অনেকটা সুনিশ্চিত। একারণে, সব সময়েই পরবর্তী সম্ভাব্য স্রাব তারিখের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ডিম্বস্ফোটনের দিনটি ঠিক করতে হবে।

মাসিক চক্রের দিন ↓	← স্রাব সুরু হওয়ার পর দিনগুলির সংখ্যা →																																								
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
২০							⊙														?																				
২১								⊙														?																			
২২									⊙														?																		
২৩										⊙														?																	
২৪											⊙														?																
২৫												⊙														?															
২৬													⊙														?														
২৭														⊙														?													
২৮															⊙														?												
২৯																⊙														?											
৩০																	⊙														?										
৩১																		⊙														?									
৩২																			⊙														?								
৩৩																				⊙														?							
৩৪																					⊙														?						
৩৫																						⊙														?					
৩৬																							⊙														?				
৩৭																								⊙														?			
৩৮																									⊙														?		
৩৯																										⊙														?	
৪০																											⊙														?

ডিম্বস্ফোটন
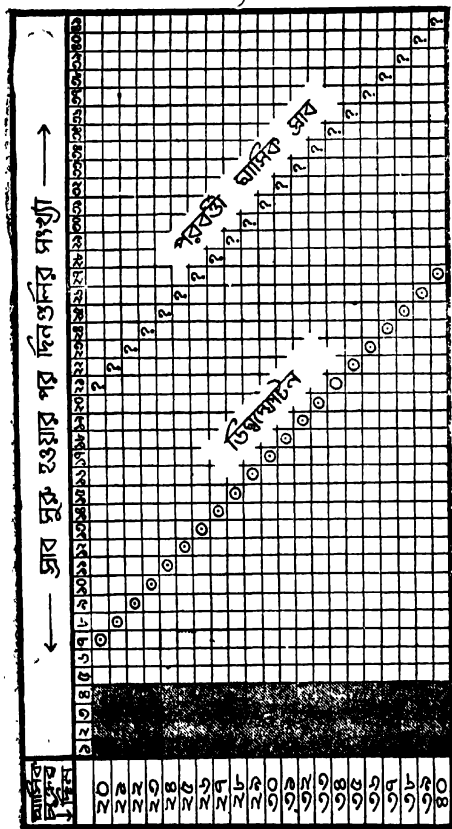
পরবর্তী মাসিক স্রাব

৭নং ছবি—'ডিম্বস্ফোটন তথা উর্বরকালের দিনপঞ্জী'

পরবর্তী মাসিক স্রাব ২৮ দিন পরে দেখা দিলে ডিম্বস্ফোটন মাসিক চক্রের ১৫ দিনের দিন হবে। এভাবে ২১ থেকে ৪১ দিনের দিন পরবর্তী স্রাব দেখা দিলে ডিম্বস্ফোটনের তারিখটি এই ছবি থেকে পাওয়া যাবে। আর এই দিনটির আগে ৪ দিন ও পরে ৩ দিন যোগ করলেই ঐ মাসিক চক্রের উর্বর দিনগুলির দেখা পাব।

● শুধু মাসিক চক্রের তথ্যাদি থেকে কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে ডিম্বস্ফোটন-কাল নির্ণয় করা যায়। আরও সুনিশ্চিত হতে চাইলে প্রাতঃকালীন দেহতাপ ও ডিম্বস্ফোটনের লক্ষণগুলির সাহায্য নিতে হবে।

ডিম্বাণু—এটা সর্বজনস্বীকৃত যে ২৪ ঘণ্টার পর ডিম্বাণু বেঁচে থাকতে পারে বটে, কিন্তু নিষিক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ ডিম্বস্ফোটনের পর ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিম্বাণুর প্রজননক্ষমতা থাকে।

শুক্রকীট—উপযুক্ত পরিবেশে, শুক্রকীট বেঁচে থাকতে পারে দিনের পর দিন। কিন্তু, বীর্যস্খলনের পর স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অভ্যন্তরে শুক্রকীটের প্রজননক্ষমতা ৪৮ ঘণ্টার বেশী নয়।

মাসিক স্রাব—বছরের পর বছর প্রতিটি মাসে একই সময়ে (যেমন ২৮ দিন পর পর) মাসিক স্রাব দেখা দেয় না বলেই, ডিম্বস্ফোটনকাল মারাত্মকভাবে পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ মাসিক স্রাব অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে এলে, স্রাবের অব্যবহতি পরেই (৫।৭ দিনের দিন) ডিম্বস্ফোটন হবে। আবার স্রাব অত্যধিক বিলম্বিত হলে, ডিম্বস্ফোটন-কালও সেই অনুপাতে (২৫।৩০ দিনের দিন) পিছিয়ে যাবে। কিন্তু সব সময়েই পরবর্তী স্রাবের ১৪ দিন আগে। তাই, স্রাব কতদিন এগিয়ে যেতে পারে আবার কতদিন পিছিয়ে আসতে পারে তা কিছুকাল লক্ষ্য করতে হবে। এ থেকেই দীর্ঘতম ও হ্রস্বতম মাসিক চক্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। এই দুই সীমারেখার ব্যবধান দশ দিনের বেশী হলে মাসিক স্রাব অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

উর্বরকাল নির্ধারণ—এযাবৎ আলোচিত তথ্যে উর্বরকাল নির্ধারণের মূলসূত্র নিহিত আছে। এই মূলসূত্র হল :

(১) মাসিক চার্ট রাখার অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ কোন তারিখে মাসিক স্রাব দেখা দেয় তা লিখে রাখতে হবে। অন্তত

পক্ষে এক বছরের হিসেব প্রয়োজন। এতদিন ধৈর্য না থাকলে আট মাস কিংবা ছ' মাসের হিসেব হলেও চলে। এ থেকে সবচেয়ে কত কম সময়ে এবং সবচেয়ে কত বেশী সময়ে ঋতুস্রাব দেখা দেয় তা জানা যাবে। এই তথ্য দু'টির সাহায্যে পরবর্তী স্রাব কবে হবে তারই হিসেব করতে হবে।

(২) তারপর, ডিম্বস্ফোটন-কাল নির্ণয়। পরবর্তী স্রাবের ১৪ দিন আগে ডিম্বস্ফোটন হয়, এই সূত্র ধরে হিসেব করতে হবে। কিংবা ডিম্বস্ফোটনের দিনপঞ্জী (৭ নং ছবি) দেখে।

(৩) ডিম্বস্ফোটনের পর ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিম্বাণু কার্যক্ষম থাকে, তাই ডিম্বস্ফোটন-কালের পরে এক দিন যোগ করতে হবে।

(৪) ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করেছে, এমন শুক্র-কীটের ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে। অতএব, ডিম্বস্ফোটন-কালের আগে দু'দিন যোগ করতে হবে।

(৫) অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে এই নির্দেশিত দিনগুলির আগে ও পরে আরও দু'দিন করে যোগ করতে হবে।

(৬) এভাবে চিহ্নিত উর্বর দিনগুলিতে মিলন নিষিদ্ধ। অন্যান্য অনুর্বর দিনে স্বাভাবিকভাবে মিলনের তৃপ্তি পেতে বাধা নেই।

(৭) 'নিষিদ্ধ ক্ষেত্র' অধ্যায়ে উল্লিখিত 'দুষ্ট সময়'এর সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। এরকম কিছু দেখা দিলে অনুর্বর দিনগুলিতেও মিলন বন্ধ রাখতে হবে। অবশ্য নিয়ন্ত্রিত মিলনে কোন আপত্তি নেই।

এবারে একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরুন একবছরের হিসেব থেকে জানা গেল, হ্রস্বতম ও দীর্ঘতম মাসিক চক্র হল যথাক্রমে ২৪ ও ২৯ দিন। এখন এই নারী ১লা ফাল্গুন ঋতুমতী হয়েছেন। তা হলে পরবর্তী স্রাব খুব সম্ভব ২৫শে ফাল্গুন থেকে ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে দেখা দেবে। এখন ডিম্বস্ফোটনের

দিনপঞ্জী থেকে ডিম্বস্ফোটনকাল নির্ধারণ ; এই নারীর ডিম্বস্ফোটন হবে ১১ই ফাল্গুন থেকে ১৬ই ফাল্গুনের মধ্যে। ডিম্বাণু ও শুক্রকীটের জন্যে আগে দু'দিন ও পরে একদিন যোগ করলে এই নারীর উর্বরকাল হবে ৯ই ফাল্গুন থেকে ১৭ই ফাল্গুন। অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে সামনে ও পিছনে আরও দুদিন ধরতে হবে। তা হলে এই নারীর প্রজনন ক্ষমতা ৭ই ফাল্গুন থেকে ১৯শে ফাল্গুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই গণ্ডীর বাইরের দিনগুলি নিরাপদ। এই ভাবে প্রতিটি মাসে উর্বরকালের হিসেব পাওয়া যাবে।

প্রাতঃকালীন দেহতাপ—মাসিক চার্ট ছাড়া আরও দুটি উপায়ে উর্বরকাল নির্ধারণ করা যেতে পারে। একটি হল প্রাতঃকালীন দেহতাপ, অপরটি ডিম্বস্ফোটনের নানাবিধ লক্ষণ। প্রথমে তাপজ পদ্ধতিটির কথাই বলব।

এই পদ্ধতির জন্যে চাই একটি ভাল জ্বর দেখার থার্মমিটার আর কয়েকটি গ্রাফ পেপার। থার্মমিটারে তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট নামিয়ে রেখে রাত্রে বিছানায় রেখে দিতে হবে। পরের দিন সকালে ঘুমভাঙ্গামাত্রই ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিটকাল থার্মমিটারটি জিভের নীচে রেখে দিতে হবে। বিছানা থেকে না উঠে, কোন কথাবার্তা না বলে, কোন কিছু না খেয়ে এই কাজ সারতে হবে। তাপমাত্রা খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে আর ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত ছবির মত গ্রাফ পেপারে প্লট করতে হবে।

এই ভাবে তাপমাত্রা এঁকে গেলে দেখতে পাবেন : স্রাবের পর দেহতাপ কমে গেছে এবং ডিম্বস্ফোটন না হওয়া পর্যন্ত কমেই থাকে। তারপর হঠাৎ কমে গিয়ে, হঠাৎ বেড়ে যায়। এটা ডিম্বস্ফোটনেরই লক্ষণ। এই হঠাৎ বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা বেশীই থাকে, পুনরায় মাসিক না হওয়া পর্যন্ত। মাসিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমে
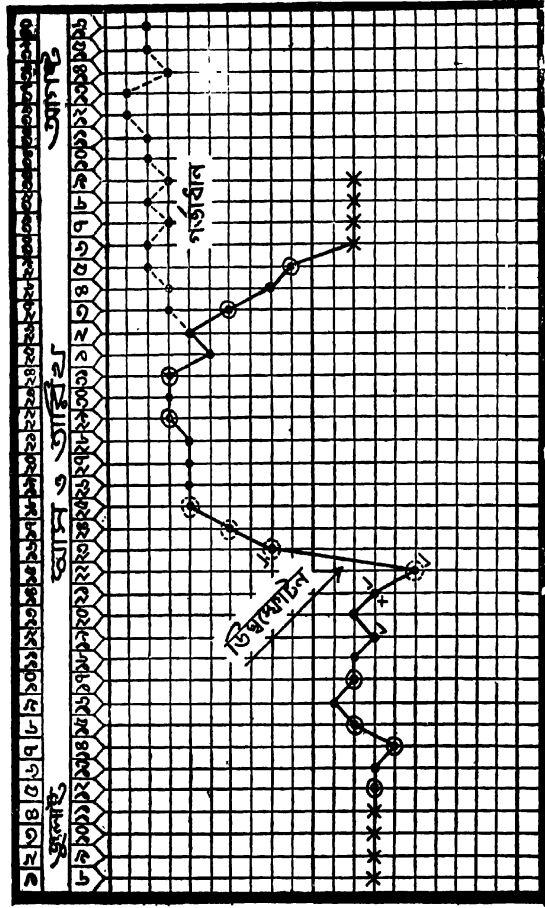
৮নং ছবি—প্রাতঃকালীন দৈহিক তাপমাত্রার সাহায্যে ডিম্বস্ফোটনকাল নির্ণয়। × মাসিক স্রাব। √ সাদা স্রাব। + পেটে ব্যথা। ○ নিয়ন্ত্রিত মিলন (জন্মনিয়ন্ত্রণেচ্ছু দম্পতিদের জন্যে)। ◌ মিলন (সন্তানেচ্ছু দম্পতিদের জন্যে)।

যায়। মাসিক না হলে অর্থাৎ গর্ভাধান হলে, এই তাপমাত্রা কমত না বরং আরও বেড়ে যেত (৮নং ছবি দেখুন)।

এই পদ্ধতিতে মাসিক স্রাবের পরই মিলন বন্ধ রাখতে হবে। দেহ-তাপের ওঠানামা কবে যে হবে তা প্রথম থেকে আন্দাজ করা বড় শক্ত, তাই। তাপমাত্রার সুনির্দিষ্ট তারতম্যের সময় ডিম্বস্ফোটন যে ঘটবেই তা নয়, এর আগে কিংবা পরে এই স্ফোটন হতে পারে। একারণে গ্রাফ পেপারে যেদিন তাপমাত্রার ওঠা-নামা দেখবেন সেদিন থেকে আরও পাঁচদিন সহবাস বিরতি। তারপর থেকেই অনুর্বরকালের শুরু।

এই পদ্ধতিতে মিলনের দিনগুলি নেহাতই অল্প বলে অনেকেরই মন ওঠে না। তা হলেও, অনিয়মিত ঋতুমতীদের কাছে এই তাপজ পদ্ধতি অশেষ উপকারী।

দৈহিক লক্ষণ—কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধিমতী ও অতিমাত্রায় সংবেদনশীল নারী কবে ডিম্বস্ফোটন হয় তা জানতে পারেন। এদের সংখ্যা অতি নগণ্য। জানতে না পারাটাই স্বাভাবিক, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা জানতে পারে না। নির্ভরযোগ্যতার বিচারে ডিম্বস্ফোটনের দৈহিক প্রকাশগুলির ক্রমপর্যায় হল :

(১) তলপেটে একটু ব্যথা।

(২) কাপড়ে একটু রক্তের দাগ লাগা অথবা লালচে ধরনের সাদা স্রাব।

(৩) একটু বেশী সাদা স্রাব। স্বচ্ছ, চটচটে, আঠাল ধরনের স্রাব।

(৪) ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবে কষ্ট ; স্তনে ব্যথা ; হঠাৎ অস্বস্তিবোধ (পেট ফাঁপা, বমি-বমি ভাব) ; হঠাৎ যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি দুই স্রাবের মাঝামাঝি সময়ে অথবা পরবর্তী স্রাবের প্রায় দিন চোদ্দ আগে দেখা দেয়। লক্ষণগুলি হঠাৎ অল্পক্ষণের জন্যে দেখা দেয়। আবার মিলিয়ে যায়। এজন্যে অনেকেই এই সূক্ষ্ম

পরিবর্তন বুঝতে পারেন না। তবে কেউ যদি কোন একটি কিংবা একাধিক লক্ষণ ধরতে পারেন, ডিম্বস্ফোটনের সম্ভাব্যকালও জানতে পারবেন। লক্ষণ দেখা দেবার ৪ দিন পর থেকেই নিরাপদ সময় আরম্ভ হবে এবং পরবর্তী স্রাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকবে।

সুবিধা ও অসুবিধা—স্বাভাবিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে তিথি-সহবাসের সুবিধাগুলি সব চেয়ে বেশী মোহময় বলেই এই পদ্ধতির ভক্ত এত বেশী। রতিতৃপ্তিতে কোন বাধা নেই, কোন দ্রব্য প্রয়োগের ঝামেলা নেই আর কোন খরচ-খরচাও নেই।

এত ঢালাও সুখসুবিধা থাকলেও কিছু কিছু অসুবিধা যে না আছে তা নয়: (১) উর্বরকালটা না হয় দিনপঞ্জী দেখে আসে, যৌন উত্তেজনা ত' দিন তারিখ গুনে শুধু অনুর্বরকালেই আসে না। ফলে, ইচ্ছামাত্রই মিলিত হওয়া যায় না। তাছাড়া উর্বরকালের ১০।১২ দিন সহবাস বিরতি অনেকেরই কাছে কষ্টকর। (২) ইচ্ছামাত্রই প্রয়োগ করা যায় না। অন্তত ছ' মাসের মাসিক চার্ট থাকা চাই। (৩) শুভঙ্করীর মত সহজ সুন্দর নিয়ম নেই। বিগত স্রাবকাল থেকে হিসেব করার নিয়ম থাকলে পদ্ধতিটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত। (৪) এমন কি অনুর্বরকালেও 'দুষ্ট সময়'এর দৌরাত্ম্য দেখা দিতে পারে। এতদনুরূপ ত্রুটিযুক্ত বলেই পদ্ধতিটি আদর্শসুলভ আখ্যা পেল না।

কাদের জন্যে ?—পদ্ধতিটি মুষ্টিমেয় কয়েক জনের জন্যে, নিয়মিত-ভাবে ঋতুমতী, সর্বতোভাবে সুস্থ ও বুদ্ধিমতী নারীদের জন্যে। কিছু শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন, কিছু হিসেবনিকেশ আর কিছু ধৈর্যেরও। এজন্যে পদ্ধতিটি সর্বসাধারণের জন্যে নয়। তা হলেও, এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে তিথি-সহবাস অপরিহার্য:

(১) ধর্মীয় নিষেধ—ক্যাথলিকদের কাছে তিথি-সহবাস অন্যতম প্রধান অবলম্বন বিশেষ। জন্মরোধক দ্রব্যাদির প্রয়োগ পাপজনক, তাই।

(২) যৌন নিষেধ—প্রয়োগসাপেক্ষ জন্মরোধক পদ্ধতিগুলি বিরক্তিজনক কিংবা যৌনপ্রদ না হলে, তিথিসহবাস দম্পতির শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

(৩) জন্মরোধের প্রয়োজনীয়তা যেখানে নামমাত্র—এক্ষেত্রে, অনেকটা পরীক্ষাচ্ছলে প্রয়োগ করার মত, তিথি-সহবাস মন্দ নয়।

নিষিদ্ধক্ষেত্র—নিম্নলিখিত প্রতিকূল ক্ষেত্রগুলি প্রত্যেক তিথি-সহবাস ভক্তের জানা উচিত :

১। **অনিয়মিত মাসিক স্রাব**—স্রাব তারিখের ব্যবধান দশ দিনের বেশী হলে এবং মাসিক চক্র একুশ দিনের কম হলে অর্থাৎ অনিয়মিত ঋতুমতীদের জন্যে তিথি-সহবাস অচল।

২। **দুষ্ট সময়**—(১) সন্তান প্রসবের পর (ছমাস থেকে এক বছর) এবং গর্ভপাতের পর (তিন থেকে ছমাস), যতদিন না মাসিক স্রাব নিয়মিত হয়; (২) বিয়ের পর, যতদিন না নিজেদের মধ্যে যৌনতার সামঞ্জস্য ঘটে; (৩) কোন কারণে যৌন উত্তেজনা চরমে উঠলে (যেমন দীর্ঘ বিরহের পর মিলন) কিংবা যৌন ব্যাপারে কোন অশান্তি বা উৎকণ্ঠা দেখা দিলে; (৪) কোন অসুখ-বিসুখে এমন কি সর্দি-কাশি, সামান্য জ্বর হলেও; (৫) দুর্ভাবনা (পীড়িত স্বামী), দুশ্চিন্তা, হঠাৎ মানসিক আঘাত (প্রিয়জনের দুর্ঘটনা), উৎকণ্ঠা প্রভৃতি কারণে মানসিক আলোড়ন কিংবা প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাবে এবং (৬) ক্লান্তি, অত্যধিক পরিশ্রম, ঋতুপরিবর্তন, দূর পাল্লার ভ্রমণ ইত্যাদি কারণে দেহগত পরিবর্তনের ফলে মাসিক চক্র তথা ডিম্বস্ফোটনকালের স্বাভাবিকতা থাকে না। এজন্যে উপরোক্ত দুষ্ট সময়ে হয় স্বাভাবিক মিলন বন্ধ রাখতে হবে, না হয় অন্য কোন জন্মরোধক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে।

৩। **জন্মরোধ যেখানে অপরিহার্য**—এক্ষেত্রে তিথি-সহবাস বাদ দেওয়াই ভাল। এতে সাফল্যলাভ বড্ড বেশী অনিশ্চিত, তাই।

নির্ভরযোগ্যতা—মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি, মাসিক স্রাবের প্রথম দিন থেকে গুনে আট থেকে কুড়ি দিনের মধ্যেই উর্বরকাল সীমিত থাকে। যদি মাসিক স্রাব ২৬ থেকে ৩২ দিনের মধ্যে হয়, তবেই। অর্থাৎ মাসিক স্রাব ২৬ দিনের আগে কিংবা ৩২ দিনের পরে দেখা দিলে এই নিয়মটি খাটে না। মাসিক স্রাবের এই নিয়ম বা অনিয়মের জন্যেই তিথি-সহবাসে সাফল্যলাভের হার কোথাও উল্লসিত হওয়ার মত। কোথাও-বা শুধু ব্যর্থতার প্রতীক। অর্থাৎ সাফল্যের চেয়ে অসাফল্যই বেশী। এর অর্থ এই নয় যে, এটি স্রেফ বাজে-কেবলই আশাভঙ্গ। কেননা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও যোগ্য পাত্রে, বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োজ্য হলে, সাফল্যলাভ আছে।

মাসিক চক্রের প্রতিটি দিনেই গর্ভ-সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে। কখন সবচেয়ে বেশী, কখন কম, কখন-বা একেবারেই কম। উর্বরকালে গর্ভাধান ঘটে সবচেয়ে বেশী আর স্রাবপূর্ব সপ্তাহে সবচেয়ে কম। বাদ বাকী অন্য সময়ে গর্ভ-সংখ্যা কম হলেও, গর্ভাধান যে ঘটতে পারে তা সুনিশ্চিত। এমন কি ঋতুকালেও। অর্থাৎ যে কোন দিনে গর্ভ হতে পারে। এজন্যেই নিরাপদকালীন সহবাস সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ নয়। তাই, একক পদ্ধতি হিসেবে এটা পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু পরিপূরক পদ্ধতি হিসেবে, শুধু বিশেষ ধরনের জেলী সহযোগে কিংবা অন্য কোন পদ্ধতির (যেমন খণ্ডিত সুরত. কনডম্, ট্যাবলেট) আশ্রয়ে এর মূল্য অনেক।

অধিককাল শিশুকে স্তন্যদান

শিশুকে স্তন্যদানকালে গর্ভ বড় একটা হয় না, এই আশায় অনেক মায়েরা যতদিন পারে শিশুকে স্তন্যদান করে চলে, দেড় থেকে দুবছর, কি আরও বেশী সময় পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এক বছরের বেশী স্তন্যদানে শিশু ও মাতা উভয়েরই ক্ষতি হতে পারে।

শিশুকে স্তন্যদানের ফলে গর্ভ-সম্ভাবনা কমে যায়, এটা সত্য। তেমনি এটা আরও বেশী সত্য যে, স্তন্যদানকালীন ঋতুবন্ধে অপর একটি শিশু জন্ম নিতে পারে। এমন কি প্রসবের এক মাসের মধ্যেও গর্ভ হতে পারে। একারণে, কোন ঝুঁকি নিতে চায় না, এমন দম্পতিকে গর্ভরোধের আশ্রয় নিতেই হবে। প্রসবোত্তর ঋতুবন্ধে গর্ভাশঙ্কা (২%-৬%) খুব কম বলেই যে কোন একক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (যেমন, জেলী মাখানো কনডম্ বা ডায়াফ্রাম্ কিংবা শুধু বিশেষ ধরনের জেলী) ব্যবহার করলেই চলে।

সবশেষে, স্তন্যদানকালে ঋতুমতীদের কথা। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভ-সম্ভাবনা বেড়েই চলে। এজন্যে শিশুকে স্তন্যদান করা সত্ত্বেও, ঋতুস্রাব শুরু হওয়া মাত্রই, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির (যে কোন দ্বৈত পদ্ধতি) পুরো প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্যর কৃচ্ছ্রসাধনে ক্লিষ্ট দম্পতিদের সন্ধান মাঝে মাঝে যে না মেলে তা নয়। হিসেব করে দেখা গেছে, শতকরা দুই থেকে এগারো জন দম্পতি ব্রহ্মচর্যর আশ্রয় নেয়, কখন এক-আধ বছর, কখন-বা তারও কম বা বেশী সময়ের জন্যে। কোথাও স্বামী-স্ত্রীর অসুখের জন্যে, কোথাও-বা অন্য কোন কারণে।

কেন ?—গর্ভরোধের জন্যে এই অদ্ভুত অথচ সুনিশ্চিত পন্থাটি নানান কারণে ব্যবহৃত হতে পারে। কোথাও 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' (কেবলমাত্র গর্ভাধানের জন্যেই যৌন তৃপ্তি)—এই আদর্শের মোহে, কোথাও-বা ধর্মমতের (যেমন ক্যাথলিক) চাপে ব্রহ্মচর্যে আস্থা স্থাপন। কেউ জন্মনিয়ামক পদ্ধতি প্রকৃতিবিরোধী, পাপজনক, এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে, কেউ-বা দায়ে পড়ে কিংবা মরিয়া হয়ে ব্রহ্মচর্যের জয়গান করে। যাদের অনেক ছেলেপিলে হয়েছে বা

প্রত্যেক বারেই জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে, এমন অনেক দম্পতি মরিয়া হয়ে এর আশ্রয় নেয়। গর্ভনিয়ন্ত্রণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ অথচ নির্ভর-সুদৃঢ় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জানে না, এমন দম্পতিও দায়ে পড়ে সুনিশ্চিত ও অব্যর্থ পদ্ধতি হিসেবে ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য হয়। কোথাও-বা আরও বিচিত্র কারণে, নিজের মনোগত বা কামগত দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে। এখানে মিলন কোন রকমে স্থগিত রাখাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সন্তান নিয়ন্ত্রণ গৌণ ব্যাপার।

পদ্ধতিটি কি সহজ ?—মোটেই নয়। ব্রহ্মচর্যের স্থায়িত্বকাল ও রূপ, এবং পাত্র-পাত্রীর অবস্থা ভেদে (বিবাহ, যৌনতা ইত্যাদি) পদ্ধতিটি কোথাও সহজ, কোথাও কষ্টকর। দুর্বল যৌনশক্তি বা কামনা নিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন হয়ত সহজ, কিন্তু স্বাভাবিক কামশক্তির নর-নারীর কাছে এটা যাতনাদায়ক। তাই, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রয়োজনীয় পূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্রহ্মচর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে অসম্ভব কিংবা অতীব কষ্টকর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ণ এই অর্থে যে স্ত্রীর সঙ্গে কোন রকম মিলন চলবে না। আর স্থায়িত্বকাল, যতদিন পর্যন্ত সন্তানলাভে প্রত্যাশী না হন, ততদিন। বলাই বাহুল্য, অপূর্ণ (বহির্যোনি সঙ্গম, পাণিমেহন ইত্যাদি) ও সাময়িক ব্রহ্মচর্যে ততটা কষ্ট নেই। সত্য কথা বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাঁটি ব্রহ্মচর্যের নাম দিয়ে যেটা চালান হয় সেটা আসলে কিন্তু সাময়িক কিংবা অপূর্ণ ব্রহ্মচর্যই (হ্যাভলক এলিস)।

অবিবাহিতের কাছে যতটা সহজ বিবাহিতের কাছে ততটা নয়। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সান্নিধ্যে চেষ্টাকৃত ব্রহ্মচর্য নিঃসন্দেহে কষ্টকর। তাই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য, আর যেখানেই চলুক না কেন, বিবাহিত জীবনে চলে না। সাময়িক ব্রহ্মচর্য, যাকে আমরা বিরহ বলি, দাম্পত্য জীবনে চলে। তা হলেও দৈহিক সম্পর্ক-ছেদের মাত্রার দিকে স্বামীস্ত্রী

উভয়েরই লক্ষ্য রাখা উচিত। মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হলে, কোন পক্ষের কষ্ট হলে, অপর পক্ষের উচিত এগিয়ে আসা এবং যে কোন উপায়ে (যেমন, বহির্যোনি সঙ্গম) তৃপ্তি বিধান করা।

ব্রহ্মচর্য কি ক্ষতিকর ?—পাত্র-পাত্রী বিশেষে ক্ষতিকর, আদর্শ ভেদে নিরাপদ।

মানসিক অবস্থা যেখানে নিঃসংঘাতময়, আদর্শ যেখানে বলিষ্ঠ, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। উদাহরণস্বরূপ ধর্মপ্রাণ পুরুষ, সাধু সন্ন্যাসীদের উল্লেখ করতে পারি। আদর্শ রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে যৌনতা উৎসর্গীকৃত আর যৌনত্যাগের কোন সংঘাত নেই বলেই এঁদের জীবনে ব্রহ্মচর্য ক্ষতিকর নয়।

কিন্তু, বলিষ্ঠ আদর্শ নেই, দেহ যৌনভোগে পুরোপুরি বিশ্বাসী, এমন মানুষ জোর করে যৌনত্যাগের নীতি আমদানি করলেই মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব তথা অঘটন দেখা দেবে। প্রথম প্রথম বেশী মাত্রায় সুপ্তিস্খলন, ঘন ঘন কামোত্তেজনা দেখা দেবে। তারপর অস্থিরতা কর্মে অনাসক্তি বা ক্লান্তি, অকারণে খিটখিটে মেজাজ, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ জুটবে। ব্রহ্মচর্যর মাত্রা আরও বেশী হলে বস্তিপ্রদেশে রক্ত-সঞ্চয়জনিত লক্ষণগুলি (যেমন কোমরে, তলপেটে, যৌনাঙ্গে ব্যথা) দেখা দেবে। ব্রহ্মচর্য আরও দীর্ঘায়িত হলে, মানুষের যৌনচিন্তা স্বভাবতই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়বে অথবা মিলন ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করবে। হতে হতে বিভিন্ন ধরনের যৌনবিপর্যয় ও মানসিক রোগ যেমন উৎকণ্ঠা-উন্মায়ু, হিস্টিরিয়া, এমন কি রতিজড়তা ও পুরুষত্বহীনতাও দেখা দিতে পারে।

সোজা কথায়, মন যদি শান্ত, সমাহিত থাকে, দীর্ঘকালীন ব্রহ্মচর্য সাধনে দেহের বিন্দুমাত্র ক্ষয় ক্ষতি হয় না। আর মন বিগড়ালেই, দেহে ঝড় ঝাপটা লাগবে, ক্ষতিকর উপসর্গ দেখা দেবে।

নির্ভরযোগ্যতা—*মিলনসংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে কমিয়ে* ফেললে নাকি ছেলেপিলে হয় না, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে মাসে একবার কিংবা দুতিন মাসে একবার স্ত্রীর কাছাকাছি হন। ধারণাটা ভুল, কেননা এতেও গর্ভ হতে পারে। অপূর্ণ মিলনেও ঠিক তাই। অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে যদি ব্রহ্মচর্যই বেছে নেন, এর পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের দিকে নজর দিতেই হবে। এতদস্বরূপ ব্রহ্মচর্যে গর্ভ-নিরাপত্তা চরম, শতকরা শতটি ক্ষেত্রেই সাফল্যলাভ। হলে হবে কি, আদৌ সহজ নয় আর সুদীর্ঘকাল পূর্ণ ব্রহ্মচর্যে আমাদের মত সাধারণ পাঁচজনের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। একারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ হিসেবে ব্রহ্মচর্য কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

বহির্যোনি সঙ্গম

পূর্ণ মিলনে, অঙ্গপ্রবেশ ঘটে এবং স্ত্রীঅঙ্গে বীর্যস্খলন হয়। কিন্তু বহির্যোনি সঙ্গমে অঙ্গপ্রবেশ ঘটে না আর স্ত্রীঅঙ্গে বীর্যপাতও হয় না, ফলে গর্ভ-সম্ভাবনাও থাকে না। এভাবে গর্ভ-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও এ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখি পূর্ণ মিলন যেখানে নিষিদ্ধ বা অনভিপ্রেত যেমন গর্ভাবস্থায়, ঋতুস্রাবে ও শারীরিক অসুস্থতায়।

পুরুষের লিঙ্গাগ্র এবং নারীর ভগাঙ্কুর ও ক্ষুদ্রোষ্ঠ আবৃত অঞ্চল (ভেষ্টিবিউল) অতীব সংবেদনশীল। এজন্যে এ দুই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কামকলার (ঘর্ষণ, প্রচাপন, মর্দন, স্পর্শন ইত্যাদি) প্রয়োগে, অঙ্গপ্রবেশ না করিয়েও নর ও নারী উভয়েরই কামনা তৃপ্ত হতে পারে। আর যোনিমুখের কাছাকাছি বীর্যপাত না হলে এরূপ অপূর্ণ মিলনে সেন্ট পারসেন্ট গর্ভ-নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

পূর্ণ মিলনে যতটা তৃপ্তি ততটা নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতিতে নেই। আর এই অতৃপ্তিটুকু মেনে নিয়ে এটা বেশীদিন চালিয়ে গেলে দেহের

ও মনের ক্ষতি হতে পারে। এই ছুই কারণে পদ্ধতিটি নিয়মিতভাবে প্রয়োগের জন্যে নয় আর জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে সমর্থনযোগ্যও নয়। তা হলেও, পূর্ণ উপরতির তিক্ততায় আপাতমধুর পন্থা হিসেবে, জরুরী অবস্থার চাপে এবং পন্থার অভাবে এর সমাদর আছে এবং থাকবেও। আপৎকালীন পদ্ধতি হিসেবে এটা কিন্তু খণ্ডিত সুরতের চেয়েও বেশী কার্যকরী।

অঙ্গবিন্যাস ও অঙ্গচালনা

কোন কোন আসন কৌশল এবং মিলনশেষে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কেউ কেউ করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে বিপরীত বিহার এবং অল্পস্বল্প অঙ্গপ্রবেশ সমধিক প্রচলিত। মিলনশেষে হাঁচি বা কাশি দেওয়া অথবা দাঁড়িয়ে উঠে লাফালাফি করতেও কোন কোন স্ত্রীকে দেখা যায়।

'পুরুষ উপরে, নারী নীচে' এই সাধারণ আসনটির জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। সাধারণত এই আসনে, হাঁটু মুড়ে পা ছুটো একটু ফাঁক করে, নারী চিত হয়ে শায়িত থাকে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই আসনটির নাম ফ্লেক্সন ভঙ্গী। এ জাতীয় অঙ্গবিন্যাস প্রচুর গর্ভসম্ভাবনা-যুক্ত। আর এই ফ্লেক্সন যতই বাড়বে অর্থাৎ উরুদ্বয় যতই উদরগাত্রের কাছাকাছি আসবে গর্ভ-সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে। কারণ ছুটি : এক, এতে যোনিপথে পুরুষাঙ্গের সংঘাতরেখা সমান্তরাল থাকে, উভয় অঙ্গেরই অক্ষরেখা এক হয়ে মিশে যায়। ফলে বীর্যপাত হবে জরায়ু-মুখের খুব কাছাকাছি। ছুই, স্ত্রীঅঙ্গ উর্ধ্বমুখী থাকে বলে বীর্যটা জমাও থাকে কিছুক্ষণ। অতএব যে আসনভঙ্গীতে, যে অঙ্গকৌশলে উপরোক্ত ঘটনাগুলি এড়িয়ে যাওয়া যায় তারাই জন্মনিরোধক।

গর্ভনিয়ন্ত্রণের জন্যে অঙ্গবিন্যাস ও অঙ্গচালনার নিম্নলিখিত গুণাবলীর প্রয়োজন :

● জরায়ুমুখ থেকে যতটা সম্ভব দূরে বীর্যপাত হবে। যৌনতৃপ্তি বজায় রেখে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে উভয় অঙ্গের অক্ষচ্যুতি কিংবা সংঘাতরেখার সমান্তরলতার বিচ্যুতিকরণই শ্রেষ্ঠ উপায়।

● স্খলিত বীর্যের যথাশীঘ্র বিনিষ্ক্রমণ।

এখন কয়েকটি জন্মরোধক অঙ্গবিন্যাস ও অঙ্গচালনার কথাই বলব :

(১) পুরুষ উপরে, নারী নীচে পা দুটো সোজা লম্বা করে চিত হয়ে শায়িত থেকে মিলিত হতে পারে। এই আসনকে এক্সটেন্‌সন ভঙ্গী বলে। এই আসনে স্ত্রীঅঙ্গ ঈষৎ নিম্নমুখী থাকে। ফলে পূর্ণ প্রবেশ ঠিকমত হয় না এবং বীর্যও অল্পক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে আসে। তাই, এই আসন কিছুটা জন্মরোধক। আর এই এক্সটেন্‌সন ভঙ্গিমা যতই প্রকট হবে, অর্থাৎ উরুদ্বয় উদরগাত্র থেকে যতই দূরে সরে যাবে, জন্মরোধক মূল্য ততই বর্ধিত হবে। তাই, কটিদেশ (কোন কিছু, যেমন বালিশ, রেখে) উন্নীত হলে, গর্ভসম্ভাবনা কমে যাবে। আরও কমতে থাকবে, যতই পা দুটো শয্যাভূমির নীচে ঝুলতে থাকবে। সব চেয়ে বেশী কমে যাবে পদদ্বয়ের আগুলফ লম্বিত অবস্থানে।

(২) বসা অবস্থায়, মুখোমুখি কিংবা মুখ ফিরিয়ে পিছনের দিক্ থেকে স্ত্রীপুরুষ মিলিত হতে পারে। এই অবস্থায় উভয় অঙ্গের অক্ষচ্যুতি ঘটাতে হবে অর্থাৎ উভয়কে এমনভাবে মিলিত হতে হবে যে পুরুষাঙ্গ স্ত্রীঅঙ্গের (সামনের বা পিছনের) মাঝামাঝি জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হবে। ডাঃ ভ্যান্ ডি ভেল্ডীর মতে এই আসন দুটির জন্মরোধক মূল্য সব চেয়ে বেশী।

(৩) পাশাপাশি অবস্থায়, সামনাসামনি অথবা পিছনের দিক্ থেকে মিলিত হলে গভীর অঙ্গপ্রবেশের সম্ভাবনা আছে আর বীর্যও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে না। তাই গর্ভনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এই আসন দুটির নেই বললেই চলে। কিন্তু এর সঙ্গে অল্পস্বল্প অঙ্গপ্রবেশ কিংবা অক্ষচ্যুতি ঘটাতে পারলে কিছুটা জন্মরোধক মূল্য এই আসনে বর্তাবে।

(৪) বিপরীত বিহার অর্থাৎ 'পুরুষ নীচে, নারী উপরে' আসনটির জন্মরোধক মূল্য যতটা ভাবি ততটা কিন্তু নয়! শুধু বীর্যই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে বলে সামান্য একটু জন্মরোধক মূল্য এর আছে। কিন্তু এর সঙ্গে অক্ষচ্যুতি কিংবা স্ত্রীঅঙ্গে নিম্নস্খলনের যোগাযোগ ঘটাতে পারলে কিছুটা গর্ভনিরাপত্তা মিলবে।

(৫) মিলনশেষে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে; এক পা উঁচু জায়গায় (যেমন চেয়ারে) রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে; হাঁটু গেড়ে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে কিংবা সটান উপুড় হয়ে শুয়ে—এই পঞ্চবিধ অঙ্গভঙ্গীর যে কোন একটির আশ্রয়ে নীচের দিকে কোঁত দেওয়া, হাঁচি দেওয়া, কাশি দেওয়া প্রভৃতি কার্যকলাপের ফলে বীর্যটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। জরায়ুমুখের কাছাকাছি বীর্যপাত হলেও, ভিতরে জমে থাকতে পারে না, সোজা নীচে নেমে আসে। তাই, আপৎকালীন পদ্ধতি হিসেবে মিলনোত্তর অঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গচালনার মূল্য অনেক।

পদ্ধতিগুলি বৈচিত্র্য ও উত্তেজনায় ভরপুর হলেও, নির্ভর-সুদৃঢ় নয়। তাই, অপরিহার্য জন্মরোধের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাহলেও বৈচিত্র্যের জন্যে কখনো সখনো প্রয়োগ করা যায় আর জরুরী অবস্থায় এটা ত' অন্যতম করণীয় বিশেষ।

উধ্বরেতঃ সঙ্গম

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও বস্তিপ্রদেশের সঙ্কোচন-প্রসারণের সাহায্যে স্খলনোন্মুখ বীর্য উধ্বগামী করা যায়। আর শেষ সময়ে লিঙ্গমূলে চাপ

দিয়েও এটা সম্ভব। এই বিচিত্র পদ্ধতিটি হল উর্ধ্বরেতঃ সঙ্গম। পুরাকালে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে এর রেওয়াজ ছিল, এখনও আছে। বর্তমান কালে কোন কোন সংসারী পুরুষকেও এর আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

উর্ধ্বরেতঃ সঙ্গমে বাইরে এক ফোঁটা বীর্য বেরিয়ে না এলেও, বীর্যস্খলন ঠিকই ঘটে। স্খলনোন্মুখ বীর্য রুদ্ধপথে ধাক্কা খেয়ে স্বস্থানে ফিরে যায় না, সোজা মূত্রস্থলীতে চলে যায়। পরে মূত্রত্যাগের সময় প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। অতএব, আর যাই হোক না কেন, বীর্য রক্ষা হয় না। প্রাক্‌স্খলন উত্তেজনা ক্ষরণ ও স্খলনোন্মুখ চোরাখাদের (চাপ-দেওয়া সত্ত্বেও সামান্য কিছুটা বীর্য ক্ষরিত হতে পারে) শুক্রকীটের জন্যে পদ্ধতিটি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। আর আদৌ সহজ নয়, যৌনগ্রাহ্য ত' নয়ই। পুরোপুরি যৌনতৃপ্তি নেই বলেই, দীর্ঘকালীন প্রয়োগে খণ্ডিত সুরতের তথাকথিত ক্ষতিগুলি দেখা দিতে পারে। তাই, উর্ধ্বরেতঃ সঙ্গম আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।

ব্যবহিত সুরত

এই পদ্ধতিতে রতিক্রিয়া সুদীর্ঘকাল বিলম্বিত করা হয় আর বীর্যপাতের নামগন্ধও করা হয় না। দীর্ঘায়িত সুরতে নর-নারী উভয়েই তৃপ্ত হলে, পুরুষ নিজ অঙ্গ প্রত্যাহার করে। বীর্যস্খলন কোথাও হয় না। স্ত্রীঅঙ্গেও নয়, বাইরেও নয়। এমন কি উর্ধ্বরেতঃ সঙ্গমের মত ভিতরে ভিতরে চোরাস্খলনও নয়। এই বিচিত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নাম ব্যবহিত সুরত।

আমাদের দেশে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে এর চলন ছিল এবং এখনও আছে। বিশেষ করে আউল, বাউল ও সহজিয়াদের মধ্যে। এঁদের কাছে এর পরিচয় বিন্দুসাধন নামে।

জন্মরোধক পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী এর প্রতিষ্ঠা দেখি ওনিডা সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পর থেকে। জন হামফ্রে নোয়েসের প্রচেষ্টায়

আমেরিকায় নিউইয়র্কের ওনিডা অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে, ১৮৪৬ সালে। সম্ভ্রান্তবংশীয়, শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ৩০০ জন নর-নারী ৩০ বছর ধরে উচ্চতর সৌজাত্যবিদ্যা ও নতুন ধরনের বিবাহ-প্রথা প্রচার করে গেছেন। এই বিবাহ-প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বামী স্ত্রী ছিল এবং অবাধ যৌনসাহচর্যের অধিকার প্রত্যেকেরই ছিল। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষের সন্তানের জন্ম দেবার অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্বাচিত নর-নারীকে সন্তানোৎপাদনে আহ্বান করা হত। দু'তিন দিন অন্তর তারা মিলিত হত এবং বীর্যপাতবিহীন মিলন এক থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হত। ১৮৭৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ ঘটে।

পদ্ধতিটি আদৌ সহজ নয়। বীর্যপাত ব্যতিরেকে কামতৃপ্তি প্রচুর সাধনাসাপেক্ষ। শুধু তাই নয়, এতে মনের উপর এত বেশী চাপ পড়ে যে দুদিন যেতে না যেতেই ক্ষতির আবির্ভাব ঘটে। খণ্ডিত সুরত ও ব্রহ্মচর্য অধ্যায়ে যে সব দৈহিক ও মানসিক ক্ষতির কথা বলেছি তার সবই ব্যবহিত সুরতে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ পদ্ধতির দীর্ঘকালীন প্রয়োগে শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু বিশ্ববরেণ্য মনীষীদ্বয় ডাঃ হ্যাভলক এলিস ও ডাঃ আর. এল. ডিকিনসনের কাছে ক্ষতির চিত্রটি এত ভয়াবহ ও মারাত্মক নয়। তাহলেও, এটুকু বলতে কোন দ্বিধা নেই, আমাদের মত সাধারণের জন্যে ব্যবহিত সুরত নয় আর দীর্ঘকাল ব্যবহারের জন্যে ত' নয়ই। নির্ভরযোগ্যতার বিচারে, এটা খণ্ডিত সুরতের মতই প্রাক্-স্খলন চোরা শুক্রকীট এবং বিলম্বিত সুরতক্রিয়ায় অল্প অল্প বীর্যস্খলনের জন্যে বিপজ্জনক। অতএব, গর্ভনিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে ব্যবহিত সুরতের প্রয়োগ অচল, অসার্থক।

রাগমোচন বিরতি

কোন কোন নারীর বিশ্বাস যে গর্ভাধানের জন্যে পূর্ণ রতিতৃপ্তি চাই-ই। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ নিজের যৌনতৃপ্তি তথা রাগমোচন থেকে বিরত থাকেন। গর্ভরোধের উদ্দেশ্যে এই যৌন প্রত্যাহারই হল রাগমোচন বিরতি।

পুরুষের মত, নারীর রাগমোচন গর্ভাধানের জন্যে অপরিহার্য নয়। কেননা স্ত্রীঅঙ্গে বীর্যপাত হলে, গর্ভসম্ভাবনা রাগমোচন হলেও যতটা থাকে, না হলেও ঠিক ততটা থাকে। অর্থাৎ রাগমোচন না হলেও গর্ভসম্ভাবনা ষোল আনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কামশীতল নারীর ৫।৭টি সন্তানের জননী হওয়ার কথা উল্লেখ করতে পারি। আবার নারীধর্ষণ ও পাশবিক অত্যাচারে গর্ভাধানের অনেক ঘটনাই ত' এর সাক্ষী। আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই পদ্ধতিতে গর্ভনিরাপত্তা এক আনাও নেই।

কামশীতল নারীর স্বভাবগত রাগমোচন বিরতিতে কোন ক্ষতি না হলেও, সুস্থ ও স্বাভাবিক নারী জোর করে যৌন উত্তেজনা দাবিয়ে রাখলে ক্ষতি হতে পারে। অতৃপ্ত যৌন উত্তেজনার ফলে বস্তিপ্রদেশে রক্তসঞ্চয়জনিত উপসর্গগুলি (তলপেট ব্যথা, কোমরে যন্ত্রণা, অত্যধিক সাদা স্রাব, অত্যধিক রক্তস্রাব, ঋতুকালে ব্যথা ও মিলনে কষ্ট) দেখা দেবে। হতে হতে মনের উপর চোট পড়ে। মিলনে অনিচ্ছা, রতিজড়তা, উৎকণ্ঠা-উদ্বায়ু প্রভৃতি নানান রকমের মানসিক ব্যাধিও দেখা দিতে পারে।

ব্যবহার-বিধির বিচারে এটা খুবই সহজ, পুরুষের ব্যবহিত স্মরতের মত কষ্টকর নয়, একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলেই হয়। কিছুমাত্র গর্ভনিরাপত্তা নেই আর ক্ষতির সম্ভাবনাও প্রচুর। তাই, জন্মনিরোধক পদ্ধতিগুলির মধ্যে রাগমোচন বিরতির কোন মূল্যই নেই।

আবরণীমূলক পদ্ধতি

শুক্রকীট নিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল কোন না কোন আবরণীর প্রয়োগ। এই আবরণী দুরকমের, পুরুষের আর নারীর। পুংজননেন্দ্রিয় সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে আবৃত করে রাখে, পুরুষের আবরণী; ফলে স্ত্রীঅঙ্গে আদৌ বীর্যপাত হয় না। জরায়ুগ্রীবা ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সামান্য কিছুটা ঢেকে রাখে, নারীর আবরণী; এতে স্ত্রীঅঙ্গে ঠিকই বীর্যপাত হয় কিন্তু হলেও, আবরণীর প্রভাবে জরায়ুমুখে সরাসরি বীর্যনিষেক হয় না আর সোজা জরায়ুমধ্যে চলে যেতেও পারে না। অর্থাৎ কিনা আবরণীর কার্যকারিতার মূলমন্ত্রই হল বীর্যরোধ তথা শুক্রকীট নিয়ন্ত্রণ। নারীর জন্যে এই বীর্যরোধক আবরণী অনেক রকমের হতে পারে, যেমন: ডায়াফ্রাম্, সার্ভাইক্যাল্, ডুমাস ও ভিমিউল প্রভৃতি ক্যাপ্ এবং স্পঞ্জ, ট্যাম্পন প্রভৃতি জরায়ুমুখের আবরণী। আর পুরুষের জন্যে এ জাতীয় আবরণী কেবলমাত্র একটিই—কন্ডম্।

কন্ডম্

কি ও কেন?—কন্ডম্ হল জননেন্দ্রিয়ের জন্যে আবরণী বিশেষ। সাধারণত এই আবরণী রবারের তৈরী। আর সচরাচর পুরুষেরাই এটা ব্যবহার করে থাকে, তাই পুরুষাঙ্গের জন্যে রবারের আবরণীই হল কন্ডম্। মিলনপূর্বে উচ্ছ্রিত অঙ্গে এই আবরণী পরিয়ে দেওয়া হয়। রবারের খাপে ঢাকা অঙ্গের সাহায্যে যে মিলন হয় তাতে স্খলিত-বীর্য এই খাপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলেই যোনি অভ্যন্তরে যেতে পারে না। এমনি করেই কন্ডম্ গর্ভাধান ঠেকিয়ে রাখে।

কন্ডমের অনেক নাম আছে। কেউ বলেন ম্যালথাসের আবরণী। আমেরিকায় একে বলে বিপদের বন্ধু। কোথাও ফ্রেঞ্চ লেটার,

সংক্ষেপে বলা হয় এফ্. এল্.। অন্যত্র কন্‌ডম্ বা শীথ্। আমাদের দেশে ফ্রেঞ্চ ক্যাপ্ (ফ্রেঞ্চ লেটারের অপভ্রংশ) বা শুধুই ক্যাপ্ কথাটি সর্বত্র চালু হয়ে গেছে। আমাদের দেশের প্রচলিত ক্যাপ্ বিদেশে শীথ বা কন্‌ডম্ আর বিদেশের প্রচলিত ক্যাপ্ আমাদের দেশে ডায়াফ্রাম্, সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ প্রভৃতি স্ত্রী-আবরণী।

পাতলা কন্‌ডম্—শুষ্ক বা পিচ্ছিলকারক দ্রব্য প্রয়োগে সিক্ত, লেটেক্স রবারের পাতলা কন্‌ডম্ অতি জনপ্রিয়। এই ক্যাপ্ সাধারণত একবার ব্যবহারের জন্যেই। তবে, যত্ন নিলে একাধিকবার প্রয়োগ করা যায়। ক্যাপ্‌টি গোটানো অবস্থায় থাকে। উন্মুক্ত অবস্থায় ক্যাপ্‌টি দেখতে লম্বা সরু খাপের মত। খাপের একটা মুখ খোলা, এরই শেষ প্রান্তে একটা রবারের রিং থাকে। উদ্দীপিত অঙ্গে ক্যাপ্‌টি ধরে রেখে দেওয়ার জন্যেই এই রিংয়ের প্রয়োজন। অপর মুখটি কিন্তু বন্ধ। এখানে স্খলিত বীর্য জমা হয়। এর জন্যে বাড়তি জায়গা করতে গিয়ে জন্ম নিল বোঁটাযুক্ত কন্‌ডম্। কোন কোন কন্‌ডমে এতদনুরূপ বাড়তি জায়গা নেই, এটা হল বোঁটাবিহীন কন্‌ডম্।
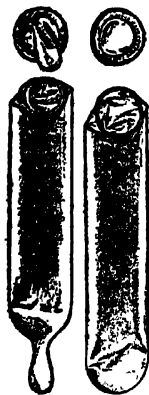
৯ ও ১০নং ছবি—দুটি পাতলা কন্‌ডম্। বাঁদিকে বোঁটাযুক্ত, ডানদিকে বোঁটা-বিহীন কন্‌ডম্। উপরের ছবি দুটি এদের গোটানো অবস্থার চেহারা।

পাতলা ক্যাপে তৃপ্তি আছে প্রায় ষোল আনা। কিন্তু মাঝে মাঝে, রবারটি খুব পাতলা বলেই, ফেটে বা ছিঁড়ে যায়। এটাই হল পাতলা ক্যাপ্ ব্যবহারের প্রধানতম অন্তরায় আর

একটা হল যে একটু বেশী খরচ পড়ে। অবশ্য, সতর্কতা সহকারে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবহার করলে এ ত্রুটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা এ পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করতে রাজী নন তাঁদের জন্যে আছে মোটা রবারের ক্যাপ্।

মোটা কন্ডম্—এই ক্যাপ্ একটু মোটা রবারের তৈরি। গোটানো থাকে না, খোলা অবস্থায় বিক্রি হয়। কন্ডম্টি অনেকবার ব্যবহার করা যায়, তাই গড়-পড়তা হিসেবে খরচও অনেক কম পড়ে। তাছাড়া, মোটা বলে বেশ নির্ভরযোগ্য পাতলা ক্যাপের মত চট্ করে ফেটে বা ছিঁড়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে না ।

হলে হবে কি, মোটা ক্যাপে যৌন অনু-ভূতি বড্ড বেশী কমে যায়। তাই, অধিকাংশ পুরুষই এটা পাতলার মত তৃপ্তিপ্রদ নয় এই অজুহাতে ব্যবহার করতে চান না।

এমন কি নারীরাও এই অভিযোগ করতে পারে। এজন্যে কেউ কেউ বুটিদার অসম-গাত্র মোটা রবারের ক্যাপ্ ব্যবহার করেন । এর গাত্র রুক্ষ হওয়ার দরুন ঘর্ষণের তীব্রতা বেড়ে যায়, এতে নাকি মেয়েরা বেশী তৃপ্তি পায়। অতিরিক্ত ঘর্ষণে স্ত্রীঅঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেই এটা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

১১নং ছবি
মোটা কন্ডম্

জান্তব কন্‌ডম্‌—রবারের মারফত দেহের উত্তাপ পূর্ণমাত্রায় সঞ্চালিত হতে পারে না বলেই রবারের কন্‌ডমে যৌন আনন্দ পুরোপুরি পাওয়া যায় না। তাই এমন একটি পদার্থ দিয়ে কন্‌ডম্‌ তৈরী হল, যা দিয়ে দেহের উত্তাপ বা অনুভূতি আদান-প্রদানে কোন বাধা সৃষ্টি হবে না। এই বস্তু জন্তু জানোয়ারের কাছ থেকে ধার করা বলেই এদের নাম জান্তব কন্‌ডম্‌। শূকর ও ভেড়ার অন্ত্র বা আন্ত্রিক আবরণী বা অন্য কোন প্রাণীর চর্ম দিয়ে এই কন্‌ডম্‌ তৈরী।
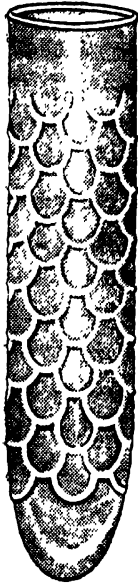
১২নং ছবি—অসম-গাত্র মোটা কন্‌ডম্‌

জান্তব আবরণবস্ত্রটি দেখতে বোঁটাবিহীন রবারের কন্‌ডমের মতই। পার্চমেণ্ট পেপারের মতই এটা পাতলা ও ঘাতসহ। তাই ৫।৬ (কি আরও বেশী) বার অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। এটা শক্ত, কিন্তু জলে ভিজিয়ে রাখলে নরম ও মোলায়েম হয়ে পড়ে। একে পাতলা জান্তব চর্ম তায় নরম, মোলায়েম ও তৈলমসৃণ, তাই পুরুষাঙ্গে আবরণীর কোন অস্তিত্ব আদৌ ধরা পড়ে না। একারণে, অত্যধিক দামী হয়েও বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়, এর এত কদর। এই অভিজাত কন্‌ডম্‌ আমাদের দেশে কিন্তু পাওয়া যায় না। তাহলেও পিচ্ছিল কন্‌ডমে (এটা আমাদের দেশে পাওয়া যায়) এর অভাব অনেকটা মিটেছে।

লিঙ্গাগ্র ক্যাপ্—পূর্ণাঙ্গ কন্‌ডমের মত অঙ্গের সবটাই ঢাকা পড়ে না, এতে শুধু লিঙ্গাগ্র ঢাকা পড়ে। বাকী অংশটুকু সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে বলে যৌনানন্দের তীব্রতা নষ্ট হওয়ার বড় একটা সুযোগ পায় না। এবং এজন্যেই এর নাম লিঙ্গাগ্র ক্যাপ্। এর আরও তিনটি
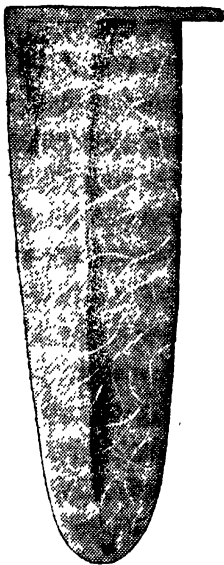
১৩নং ছবি—জান্তব কন্‌ডম্

১৪নং ছবি—লিঙ্গাগ্র ক্যাপ্

নাম আছে : ছোট এফ্. এল্., ফরাসী বা আমেরিকান টিপ। রবারের এই ছোট্ট আবরণীটি দেখতে অনেকটা মোচার মত। খোলা দিকটা লিঙ্গমুণ্ডের খাঁজে শক্ত হয়ে লেগে থাকে।

জেলী লাগিয়ে, সামনের দিকটা চুপসে ধরে, যাতে কোন হাওয়া ঐ ক্যাপের মধ্যে না থাকে, রিং বা গোল মুখটা বড় করে অঙ্গে পরিয়ে দিতে হয়। অনেকটা ছাতায় রবারের রিং ব্যবহার করার মত।

এই ধরনের ক্যাপ্ আমরা অনুমোদন করি না। এর কারণ হল এটা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা মিলনের সময় প্রায়ই খসে যায়। তবে, যাঁদের লিঙ্গাগ্র লিঙ্গমূলের তুলনায় বেশ চওড়া তাঁরা এই ক্যাপ্ ব্যবহার করতে পারেন। লিঙ্গাগ্র বেশী চওড়া বলে ক্যাপ্‌টা খুলে যেতে পারে না, তাই। আর জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পন্থাগুলির সঙ্গে (যথা জেলী, স্পঞ্জ বা ট্যাম্পন, তিথি-সহবাস) এই ধরনের ক্যাপ্ ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা ক্যাপ্ ব্যর্থ হলে, অন্যান্য পন্থাগুলিই জন্মনিরোধের কাজ চালিয়ে নেবে।

যোনিবর্ম—এই বর্মটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্যেই বিশেষ ধরনের রবারের কন্‌ডম্। দেখতে অনেকটা পুরুষদের কন্‌ডমের মতই। তবে বেশী মোটা ও শক্ত। এজন্যে অনেকবার ব্যবহার করা যায়। এর একদিক খোলা, অন্যদিক বন্ধ। খোলা মুখটার চার পাশে কিছুটা চ্যাপ্টা মত অংশ আছে। এই অংশটুকু বহির্যোনি বা ভগদেশে লেগে থাকে। খোলা মুখ থেকে বন্ধদিকের শেষ পর্যন্ত যে লম্বা অংশটুকু তা থাকে যোনি মধ্যে। ফলে স্ত্রীঅঙ্গ সম্পূর্ণভাবে আবৃত হয়ে পড়ে এবং এই কারণে কোন শুক্রকীট, কোন রতিজ ব্যাধি স্ত্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না। প্রয়োগকালে খুব ভাল করে এই স্ত্রী-কন্‌ডমের ভিতরে ও বাইরে কোন পিচ্ছিলকারক পদার্থ বা জেলী লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর ঐ লম্বা অংশটুকু দুভাঁজ করে যোনি মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এই

রবারবর্মের মধ্যেই মিলন তথা বীর্যপাত হয় বলেই জন্মনিয়ন্ত্রণ একেবারে অব্যর্থ। কিন্তু অব্যর্থ হলে হবে কি, এতে যৌনানন্দ এত অত্যধিক মাত্রায় সঙ্কুচিত হয় যে তাকে নিরানন্দ বলাই ভাল। সাধারণত সুস্থ, সংবেদনশীল পুরুষেরা একে বরদাস্ত করতে পারে না। অনেক নারীও এই কন্ডম্‌টিকে আমল দিতে চায় না। কিন্তু এই অসুবিধাকে আমরা মেনে নিতে রাজী আছি কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে। স্ত্রী বা স্বামীর রতিজ ব্যাধি থাকলে এই ক্যাপ্‌ অবশ্য ব্যবহার্য। আর যেখানেই রতিজ ব্যাধির সন্দেহ, সেখানেই যোনিবর্ম। অন্যত্র নয়, কখনই নয়।

১৫নং ছবি—যোনিবর্ম

প্রয়োগক্ষেত্র—নানাবিধ উদ্দেশ্যে কন্ডম্‌ ব্যবহৃত হতে পারে। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল :

● জন্মনিয়ন্ত্রণ—কন্ডম্‌ পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ মূলত পুরুষদের জন্যেই। তাই, পুরুষকে কতকগুলি শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হতেই হবে : (১) যথেষ্ট মাত্রায় দায়িত্ববোধ থাকা চাই। অর্থাৎ যৌন উত্তেজনার চরম আতিশয্যে কন্ডম্‌ দূরে সরিয়ে রেখে সেই বারের মত ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। (২) কন্ডম্‌ কাজে লাগাবার মত যৌনশক্তি থাকা চাই। আবরণী ব্যবহারের সময় বা ব্যবহারকালে যৌনউত্তেজনার তীব্রতা কমে যাবে না, অঙ্গ শিথিল হবে না, মিলনেচ্ছা পুরোপুরি

বজায় থাকবে। (৩) আর আবরণীর মাধ্যমে মিলনের দরুন তৃপ্তিতে যে সামান্য ঘাটতি পড়ে তা হাসিমুখে স্বীকার করে নেওয়ার মত মনোবল বা উদারতা থাকা চাই।

● রতিজ ব্যাধির প্রতিষেধক—যে মিলনে রতিজ ব্যাধির (যেমন সিফিলিস, গণোরিয়া, সফট্‌ শ্যাঙ্কার) আশঙ্কা আছে সেখানে পূর্ণাঙ্গ কন্‌ডম্‌ ব্যবহার করা খুবই যুক্তিযুক্ত। সিফিলিসের বিরুদ্ধে কন্‌ডম্‌ শুধু পুরুষাঙ্গকে রক্ষা করে বলেই এক বিশেষ ধরনের মলম (৩৩% ক্যালোমেল অয়েণ্টমেণ্ট) মিলনের একটু আগে বা পরে যৌনাঞ্চলে প্রয়োগ করা উচিত। আর যোনিবর্ম ব্যবহার করেও এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

● ত্বরিতস্খলন—দ্রুত রেতঃপাতে কন্‌ডম্‌ ব্যবহারে কখন কখন উপকার পাওয়া যায়। পুরুষাঙ্গের সংবেদনশীলতাই ত্বরিতস্খলনের একমাত্র কারণ নয় বলেই কন্‌ডম্‌ প্রয়োগে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুফল দেখা দেয় না। আর দেখা দিলেও তার কারণ আবরণী নয়; বরং কন্‌ডম্‌ পরেছি এই মানসিক প্রভাবের দরুন।

● মধুযামিনী—হানিমুন অর্থাৎ মধুযামিনীতে জেলীসিক্ত বোঁটা-বিহীন কন্‌ডম্‌ প্রয়োগ সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। এসময়ে কন্‌ডম্‌ ব্যবহার করলে দ্রুত রেতঃপাত হয় না। আর নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ ত' হয়ই। তাছাড়া নববধূকে বীর্যপাতের দরুন অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করাও হয়। একারণে সদ্য বিবাহিতদের জন্যে কন্‌ডম্‌ই শ্রেষ্ঠ জন্মরোধক পন্থা।

কন্‌ডম্‌ পন্থা—বিভিন্ন উপায়ে কন্‌ডম্‌ প্রয়োগ সম্ভব, শুধু কন্‌ডম্‌ কিংবা অন্য কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পন্থার সহযোগে। শেষোক্ত পন্থাটির লক্ষ্য, গর্ভনিরাপত্তা আরও বেশী সুদৃঢ় করে তোলা। ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলি। কন্‌ডমে ফুটো-ফাটা থাকতে পারে এবং ক্ষুদ্রতাহেতু

পরীক্ষায় ধরা না পড়তে পারে। আবার কন্ডমের অদৃশ্য ফুটো বা দুর্বলতাগুলি মিলনকালে ঘর্ষণের ফলে সত্যিকারের ফুটো-ফাটায় পরিণত হতে পারে। এখন এই সব ছিদ্রপথ দিয়ে শুক্রকীট অনায়াসে স্ত্রীঅঙ্গে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ কিনা কন্ডমের সঙ্গে যদি অন্য কোন পন্থা হাতের পাঁচ হিসেবে ব্যবহার করা না হয়, ঐ বেরিয়ে আসা শুক্রকীট জরায়ুর মধ্যে চলে যেতে পারে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে পারে। তাহলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে শুধু কন্ডম্ ব্যবহারে যে নিরাপত্তা তা প্রায় দ্বিগুণিত হয়ে দেখা দেবে যদি অন্য একটি পন্থার সহযোগ কন্ডম্ ব্যবহৃত হয়। এই দ্বৈত পন্থাই হল কন্ডম্ পন্থা। আমরা এই দ্বৈত পন্থারই অনুমোদন করি, শুধু কন্ডমের নয়।

এমন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে কন্ডমের সঙ্গে অন্য কোন পন্থাটি ব্যবহার করা উচিত। আপনি স্ত্রী-নির্ভর পদ্ধতিগুলির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে পারেন। শুক্রকীট-ধ্বংসী যে কোন জেলী, ট্যাবলেট, সাপোজিটারী ; কিংবা জরায়ুমুখ বন্ধ করে রাখতে পারে এমন কোন আবরণী। না হয়, এক সঙ্গে দু' দুটো কন্ডম্ অথবা তিথি-সহবাসের সঙ্গে কন্ডম্।

উপরোক্ত পন্থাগুলির মধ্যে জেলী সহযোগে কন্ডম্ই সব দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকেও বেশ বিশ্বস্ত ও নিরাপদ। আর, ঠিকমত উপায়ে পিচ্ছিল জেলী প্রয়োগ করলে (১) যৌনানন্দের তীব্রতা বড় একটা ঝিমিয়ে পড়ে না ; (২) স্ত্রীঅঙ্গে কন্ডমের ঘর্ষণজনিত জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না ; (৩) কন্ডমের দুর্ঘটনা (ছিঁড়ে বা ফেটে যাওয়া) বহুলাংশে কমে যায়। এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শুধুই পিচ্ছিলকারক এমন দ্রব্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী কার্যকরী গুণ যেটি (শুক্রকীট ধ্বংস করা) তা এর নেই। অন্য দিকে জেলীর এই গুণগুলি

ত' আছেই, উপরন্তু আছে শুক্রকীটকে ঘুম পাড়ানোর ক্ষমতা। তাই, জেলী সহযোগে কন্‌ডম্। আবার, জেলী সহযোগে কন্‌ডম্ ব্যবহারেরও কয়েকটি প্রণালী আছে :

● 'জেলী-সিক্ত কন্‌ডম্' পন্থা—এই পন্থায় কন্‌ডমের ভিতরে ও বাইরে জেলী দিয়ে সিক্ত করে নেওয়া হয়। ব্যবহার করার আগে পাতলা কন্‌ডম্ যদি রীতিমত পরীক্ষা করে নেন, জেলী-সিক্ত করলেই আশানুরূপ সাফল্যলাভ হয়। কিন্তু পরীক্ষা করার সুযোগ না থাকলে, পরীক্ষার ফলাফলে সন্দেহ থাকলে, কিংবা অধিকতর নিশ্চিন্ত হতে চাইলে 'জেলী + কন্‌ডম্' পন্থা চাইই। অবশ্য মোটা কন্‌ডম্ শুধু জেলীসিক্ত করলেই কাজ চলে যায়।
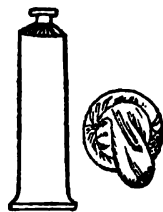
১৬নং ছবি—'জেলীসিক্ত কন্‌ডম্' পন্থা

●'জেলী + কন্‌ডম্' পন্থা—এই পন্থায় মিলনপূর্বে স্ত্রীর অঙ্গে জেলী প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী কন্‌ডম্ ব্যবহার করে। এই পন্থার নির্ভরযোগ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন শ্রেষ্ঠ পন্থার সমতুল্য। কিন্তু খরচটা 'জেলীসিক্ত কন্‌ডম্'-এর চেয়ে একটু বেশী। তাহলেও দ্বিগুণিতপ্রায় নির্ভরযোগ্যতা লাভ হয়। একারণে সাবধানীদের জন্যে 'জেলী + কন্‌ডম্'। আর যদি এই বাড়তি খরচটা বাঁচাতে চান, কন্‌ডম্ পরীক্ষা করতে শিখুন না হয় মোটা কন্‌ডম্ ব্যবহার করুন।
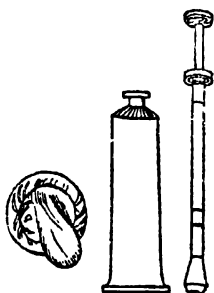
১৭নং ছবি-'জেলী + কন্‌ডম্'

কন্‌ডম্‌ নির্বাচন—অনেকেই প্রশ্ন করেন—"আমার অঙ্গের মাপ এই, কোন সাইজ ব্যবহার করব? কোনটি ঠিক হবে, বোঁটাযুক্ত না বোঁটাবিহীন? কোন ধরনের কন্‌ডম্‌ ব্যবহার করব, পাতলা না মোটা?"

সাধারণত প্রমাণ সাইজের অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি মাপের পাতলা ক্যাপ্‌ এদেশে পাওয়া যায়। এই সাইজটি প্রত্যেক পুরুষের জন্যেই। এটা লম্বায় বেশ বড় এবং চওড়ায় স্বাভাবিক মাপের। এজন্যে আপাতক্ষুদ্র অঙ্গেও এ ক্যাপ্‌ অনায়াসে ব্যবহার করা যায়, যেটুকু বেশী থাকে সেটুকু অঙ্গের গোড়ার দিকে গোটানো থাকে। আর পাতলা রবারের সহজ সম্প্রসারণশীলতার জন্যে স্থূল অঙ্গেও কোন অসুবিধা হয় না। পাতলা কন্‌ডমের মত অনায়াসভঙ্গীতে সম্প্রসারিত হতে পারে না বলেই মোটা কন্‌ডমের তিনটি সাইজ আছে, বড়, মাঝারী ও ছোট। আমাদের দেশে মাঝারী সাইজের মোটা কন্‌ডমের চলন বেশী এবং এতে প্রায় প্রত্যেকেরই কাজ চলে যায়। কোন অসুবিধা হলে এক সাইজ ছোট কিংবা বড় ব্যবহার করতে হবে।

কন্‌ডম্‌ পাতলা হবে না মোটা হবে তার জবাব পাবেন ব্যবহারে। মোটা কন্‌ডম্‌ অসহ্য হলে পাতলা ব্যবহার করুন। আর যদি দেখেন মোটা কন্‌ডমে তৃপ্তি প্রায় পুরোপুরি পেয়েছেন, স্ত্রীও বিশেষ কোন আপত্তি জানায়-নি তাহলে দ্বিধাহীনচিত্তে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে এটাই ব্যবহার করুন।

এর পরের সমস্যাটি হল—বোঁটা। মিলনশেষে ও বীর্য স্খলিত হওয়ার সময় পুরুষাঙ্গ, বিশেষত লিঙ্গাগ্র, প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে একটু বেড়ে যায়। এই বেড়ে যাওয়ার জন্যে এবং স্খলিত বীর্যের জন্যে বাড়তি জায়গা কন্‌ডমে থাকা চাই। বোঁটা না থাকলে ক্যাপ্‌ ফেটে বা ছিঁড়ে যেতে পারে, স্খলনকালে অস্বস্তিবোধ হতে পারে আর চাপের

ঠেলায় আবরণীবদ্ধ বীর্য পুরুষাঙ্গের গা দিয়ে বেয়ে বাইরে এসে স্ত্রীঅঙ্গের মধ্যে চলে যেতে পারে। এই সকল কারণে বোঁটাযুক্ত ক্যাপ্ ব্যবহার করাই উচিত। শুধু, মধুযামিনীতে বোঁটাবিহীন কন্‌ডম্ অপরিহার্য. আর বোঁটাযুক্ত কন্‌ডম্ ব্যবহারে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে বোঁটাবিহীন ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বোঁটাবিহীনের পক্ষপাতী হলে ক্যাপ্‌টির সামনের দিকে আধ ইঞ্চির মত সামান্য একটু অংশ খালি রেখে ব্যবহার করতে হবে এবং এভাবে ব্যবহৃত হলে উপরোক্ত দুর্ঘটনা বা অসুবিধার কোনটাই ঘটবে না।

কন্‌ডম্ সংগ্রহ—ভাল কন্‌ডম্ আর ভাল জেলীর জন্যে কোন নাম করা বড় ডাক্তারী দোকানে (যেখানে ডাক্তারী সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি হয়) বা কোন নির্ভরযোগ্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিকের দ্বারস্থ হতে হবে। সব চেয়ে ভাল হয়, যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিকের ডাক্তারের পরামর্শ নেন। এঁরা আপনাকে ভাল জিনিসের সন্ধান ত' দেবেনই, পরন্তু ব্যবহারবিধিও বুঝিয়ে দেবেন। আর অনুমোদিত কিংবা বিশ্বস্ত ক্লিনিকের জিনিসটা যে খাঁটি, টাটকা ও নির্ভরযোগ্য হবে তাতে কোন ভুলচুক নেই। অলিতে-গলিতে যে সব ক্লিনিক বা ছোটখাট দোকান আছে সেখানে কিংবা কোন ষ্টেশনারী দোকান বা ফুটপাতের দোকান থেকে এ সব জিনিস না কেনাই ভাল।

বিদেশে ফ্যামিলি প্লানিং সংস্থা বা ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। এঁরা একটি তালিকা মাঝে মাঝে প্রকাশ করে থাকেন। এই তালিকাতে নির্ভরযোগ্য ক্লিনিকের নাম ও ধাম, জন্মনিরোধক দ্রব্যগুলির নাম ও দাম প্রকাশিত হয়ে থাকে।

লণ্ডনস্থ ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশনের অনুমোদিত কয়েকটি দ্রব্যসামগ্রীর উল্লেখ করেছি: ডলপার, ডুরেক্স, অর্থো, কোরোমেক্স, প্রেন্টিক।

এই নামাঙ্কিত কন্‌ডম্‌ ও জেলী সংগ্রহ করুন। পাতলা কন্‌ডম্‌ একসঙ্গে বারোটির বেশী, মোটা হলে মাঝারী সাইজের একটির বেশী না কেনাই ভাল। আর শুধু জেলী-টিউব কিংবা নিক্ষেপকযন্ত্র সমেত জেলীসেট্‌ও এই সঙ্গে জোগাড় করুন।

ব্যবহার বিধি—কন্‌ডমের ব্যবহার পাঁচ জনের কাছে অতি সাধারণ ঠেকলেও মোটেই সাধারণ নয়। আপনাদের অনেকেরই হয়ত ধারণা : এর মধ্যে কি-ই বা আছে, কিনে আনব আর ব্যবহার করব। কন্‌ডম্‌ কিন্তু এতটা সাধারণ নয়, এতটা সোজাও নয়। ডায়াফ্রাম্‌ অনুরাগিণীর জন্যে যতটা শিক্ষা, প্রস্তুতি ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, কন্‌ডম্‌ অভিলাষী পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এক কথায় পুরুষকে পদ্ধতিটি শিখতে হবে, জানতে হবে আর নিয়মমত প্রয়োগও করতে হবে। কেননা ব্যবহার করাটাই সব নয়, সাফল্যলাভ করাটাই সব। এই কন্‌ডম্‌ সাফল্যের জন্যে চাই : কন্‌ডম্‌ পরীক্ষা এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ।
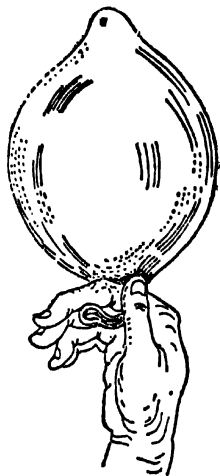
কন্‌ডম্‌ পরীক্ষা—ভাল প্রতিষ্ঠানের তৈরী হলেও, হাজার ছাপ মারা থাকলেও, নাম করা ভাল দোকান থেকে দামী জিনিস কিনে আনলেও পরীক্ষা করে না নিলে কোন কন্‌ডম্‌ই জাতে উঠবে না। কিন্তু কেন ? রবারে ফুটোফাটা প্রভৃতি ত্রুটি থাকতে পারে, এটা ধরবার জন্যেই এই পরীক্ষা। একারণে সদ্যক্রীত কন্‌ডম্‌ ব্যবহার করার আগে পরীক্ষা

১৮ নং ছবি—কন্‌ডম্‌ পরীক্ষা

করতেই হবে। শুধু তাই নয়, কন্‌ডম্ যদি একাধিকবার ব্যবহার করেন, প্রত্যেকবারই পরীক্ষা করে নিতে হবে।

প্রথমেই ভাঁজ খুলে ফেলা কন্‌ডম্‌টি ফুঁ দিয়ে ছোট মাঝারী সাইজের (১২ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি) বেলুনের মত করুন এবং খোলা মুখটা দু' পাক ঘুরিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে চেপে ধরুন, যাতে হাওয়া বেরিয়ে না যায়। তারপর কন্‌ডম্‌টি আলোর সামনে এনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করুন। প্রথমেই দেখুন কোন ফুটো-ফাটা আছে কিনা। তারপর দুর্বল স্থানের অনুসন্ধান। ফুটো থাকলে সোঁ সোঁ করে ভিতর থেকে হাওয়া বেরিয়ে আসবে কিংবা চোখেও দেখা যাবে আর দুর্বল স্থানে দেখবেন রবারটা এক জায়গায় পাতলা হয়ে এসেছে কিংবা রংটা ফিকে হয়ে গেছে। ফোলান কন্‌ডমে একটু চাপ দিলে এরূপ স্থানগুলিতে ছিদ্র দেখা দিতে পারে কিংবা মুখের কাছে আনলে গণ্ডদেশে হাওয়ার স্পর্শ লাগতে পারে। এ জাতীয় কন্‌ডম্ ফেলে দেওয়াই উচিত।
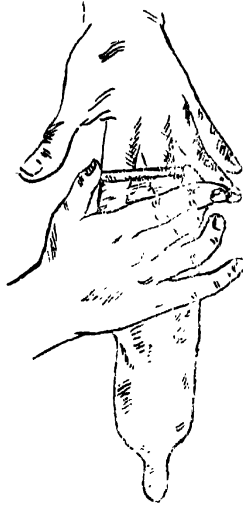
১৯নং ছবি—কন্‌ডম্ গোটানোর পদ্ধতি

জল কিংবা সিগারেটের ধোঁয়া দিয়েও পরীক্ষা করা যায়। কন্‌ডমের মধ্যে ধোঁয়া কিংবা জল দিয়ে ভরাট করুন। এখন কন্‌ডম্‌টি টিপে টিপে দেখুন কোন জায়গা দিয়ে ধোঁয়া বা জল বেরিয়ে আসছে কিনা। বেরিয়ে এলেই বুঝতে হবে ঐ জায়গায় ফুটো

আছে। হাওয়া ভর্তি কন্‌ডম্ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে পরীক্ষা করা যায়; জলের মধ্যে বুড়বুড়ি কাটলেই বুঝবেন কন্‌ডমে ফুটো আছে। পাতলা কন্‌ডম্ পরীক্ষার জন্যে বেলুন পন্থাটিই ভাল। আর মোটা কন্‌ডম্ জলে ভরাট করে পরীক্ষা করাই নিয়ম।

পরীক্ষার পর কন্‌ডম্ খোলা অবস্থায় থাকে। এখন এটাকে গুটিয়ে রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে, প্রথমেই বাঁ হাতের দু'টো আঙুল কন্‌ডমের খোলা মুখে প্রবেশ করিয়ে দিন। তারপর এই আঙুল দু'টো প্রসারিত করে দিন। এখন অন্য হাতের দু' আঙুল দিয়ে এটা আস্তে আস্তে নীচের দিকে গুটিয়ে যান। এভাবে শেষের আধ ইঞ্চি বাদ দিয়ে গোটা কন্‌ডমটি গুটিয়ে নিতে হবে।

কন্‌ডম্ প্রয়োগ—বিছানায় যাওয়ার আগে কন্‌ডম্ ও জেলী হাতের কাছে রেখে দিতে হবে। আর কন্‌ডমটি ব্যবহারের জন্যে উপযোগী করে নিতে হবে। অর্থাৎ কন্‌ডম্ পরীক্ষা করা না থাকলে, পরীক্ষা করে নিতে হবে। আর, গোটানো না থাকলে গুটিয়ে নিতে হবে।

● অঙ্গ সংযোগের পূর্বেই কন্‌ডম্ পরে নিতে হবে।

● অঙ্গ রীতিমত উদ্দীপিত ও শক্ত হলে অথবা শৃঙ্গার শেষে অঙ্গ সংযোগের অবব্যহিত পূর্বে কন্‌ডম্ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীরাই এ কাজ সেরে নেন। স্ত্রীকে দিয়েও পরিয়ে নেওয়া যায়। কন্‌ডম্ পরার সময় যাদের যৌনতা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাদের জন্যে এই শেষোক্ত পন্থা অতীব কার্যকরী।

● পুরুষাঙ্গে, কন্‌ডমের ভিতরে ও বাইরে কিছুটা জেলী প্রয়োগ করতে হবে (পিচ্ছিল কন্‌ডমের ক্ষেত্রে এই জেলীর প্রয়োজন নেই)। প্রথমেই সামান্য একটু জেলী দিয়ে অঙ্গ সিক্ত করে নিন। আর কন্‌ডমের বোঁটার মধ্যে (অথবা শেষ প্রান্তে) কিছুটা জেলী প্রয়োগ

করুন। এখন কন্ডমের বোঁটার ভিতরকার (অথবা শেষ প্রান্তস্থিত) সমস্ত হাওয়াটা বের করে দিতে হবে। তারপর বায়ুশূন্য জেলী মাখান কন্ডমের অনাবৃত লিঙ্গাগ্রে (অগ্রচ্ছদা দিয়ে আবৃত থাকলে লিঙ্গাগ্র অনাবৃত করে নিতে হবে) স্থাপন। এবং পিছনের দিকে আস্তে আস্তে কন্ডমের ভাঁজটা খুলে যাওয়া যতক্ষণ না লিঙ্গমূল পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ রবারে ঢাকা পড়ে। সবশেষে আবৃত অঙ্গে কিছুটা জেলী মাখিয়ে নিতে হবে। এখন সক্রিয় মিলন শুরু করা যেতে পারে।

● পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার জন্যে স্ত্রীঅঙ্গে নিক্ষেপক-যন্ত্রযোগে পূর্ণ মাত্রার জেলী প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। যে সময় স্বামী কন্ডম্ পরতে ব্যস্ত থাকবেন সেই সময় অথবা শৃঙ্গারকালে স্ত্রী নিজে এই জেলী প্রয়োগ করবেন। জেলীর ব্যবহার বিধি 'রাসায়নিক পদ্ধতি' অধ্যায়ে দেখতে পাবেন। স্ত্রীঅঙ্গে পূর্ণ মাত্রার জেলী প্রয়োগ করলে, কন্ডমের ভিতরে ও বাইরে জেলী প্রয়োগের এবং মিলনশেষে কন্ডম্ পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।

● স্খলনশেষে অঙ্গ শিথিল হওয়ার আগেই বিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথমেই লিঙ্গমূলে দু'আঙ্গুল দিয়ে কন্ডমটি ধরে রাখতে হবে। এই ভাবে কন্ডম্ স্থিরবদ্ধ রেখে, যত শীঘ্র সম্ভব, বিযুক্ত হতে হবে। এতে কন্ডমের খসে ভিতরে চলে যাবার কোন ভয় থাকে না আর চেপে ধরা কন্ডমের মুখ দিয়ে স্খলিত বস্তু বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না।

● মিলনশেষে পুনরায় কন্ডম্ পরীক্ষা করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন ব্যবহারের পূর্বে, ঠিক সেইভাবে। পরীক্ষায় গলদ ধরা পড়লে, বিশেষ করে ফুটোফাটা বেরিয়ে পড়লে, মুহূর্তমধ্যে প্রতিষেধক ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হবে। কন্ডম্ ফেটে বা খসে গিয়ে স্ত্রীঅঙ্গে বীর্যপাত ঘটলে এই একই কথা। কন্ডমটি যদি ভিতরে পড়ে

থাকে, এটাই প্রথমে বের করে আনতে হবে তারপর 'কিছুই নেই, বলছি শোন !' অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশ পালন।

● বীর্যপাত শেষে কন্‌ডম্ খুলে ফেলে পুনরায় অঙ্গসংযোগ করা চলবে না।

● একই রাত্রে পুনরায় মিলিত হলে অন্য একটি কন্‌ডম্ প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় কন্‌ডমের অভাবে, প্রথমটিই ধুয়ে মুছে কাজে লাগান যায়। দ্বিতীয় মিলনে প্রথমটির মতই সমস্ত নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

সংরক্ষণ প্রণালী—একটি মোটা কন্‌ডম্ ত্রিশ থেকে পঞ্চাশবার, কি আরও বেশী বার, অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। আর পাতলা কন্‌ডম্ও চার ছ'বার কাজে লাগান যে না যায় তা নয়। এবংবিধ বহু প্রয়োগের জন্যে কন্‌ডমের বিশেষ যত্ন অপরিহার্য।

কোনও পাত্রে (যেমন হেজলিনের শিশি) জল ভর্তি করে ঘরের মধ্যে একপাশে রেখে দিতে হবে এবং মিলনশেষে এরই মধ্যে কন্‌ডম্‌টি ডুবিয়ে রেখে দিতে হবে। সকালে উঠে এক ফাঁকে প্রথমেই জল দিয়ে কন্‌ডমের ভিতরে ও বাইরে পরিষ্কার করুন। তারপর কার্বলিক সাবান বাদে যে কোন গায়ে মাখা সাবানের ফেনা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘসতে থাকুন, প্রথমে বাইরের দিক, তারপর এটা উল্টে নিয়ে অর্থাৎ ভিতরের দিকটা বাইরে এনে। সাবান ঘষার পর জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। সাবানের অভাবে শুধু ঠাণ্ডা জল দিয়েও পরিষ্কার করা যায়। এখন তোয়ালে বা শুকনো কাপড় দিয়ে কন্‌ডমের ভিতর ও বাহির মুছে নিতে হবে। সবশেষে কন্‌ডমের আষ্টেপৃষ্টে পাউডার (ফ্রেঞ্চচক্, অভাবে ট্যালকম্ পাউডার) লাগাতে হবে।

এবারে নিরাপদ পাত্রে এবং সুরক্ষিত জায়গায় কন্‌ডম্‌টি রেখে দিতে হবে। আলমারীর মধ্যে কোন কৌটায় কিংবা পাউডারের

বাক্সের মধ্যে কখনও গুটিয়ে রেখে দেবেন না, লম্বা করে রেখে দেবেন। *একাধিকবার প্রয়োগ করা যায় এমন কন্‌ডম্ ব্যবহারের ঠিক পূর্বেই* গুটিয়ে নিতে হয়, তাই। গোটাবার সময় কন্‌ডমের গায়ে লেগে থাকা পাউডার ঝেড়ে নেবেন। আর কখনও তৈল বা গ্রীজ জাতীয় কোন *জিনিসের (যেমন, ভেসলীন ; স্নো বা কোল্ডক্রীম* ; নারিকেল, অলিভ বা নিম তৈল ; কোকোবাটার মিশ্রিত সাপোজিটারী) সঙ্গে রবারের কন্‌ডম্ ব্যবহার করবেন না (জান্তব কন্‌ডমে এটা সম্ভব। অবশ্য কন্‌ডম্‌টি যদি একবার ব্যবহার করে ফেলে দেন, এ জাতীয় দ্রব্য প্রয়োগে কোন আপত্তি নেই।

সুবিধা ও অসুবিধা—কন্‌ডমে সুখ-সুবিধা যে কত তা যে একবার ব্যবহার করেছে সেই জানে। পদ্ধতিটি বেশ সহজ ও সাদাসিধা।

ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়েও শুধু ভাল বই পড়ে পদ্ধতিটি আয়ত্ত করা যায়। আর একাধিকবার প্রয়োগ করলে কম খরচে সুষ্ঠু জন্মরোধ কন্‌ডমেও সম্ভব। একারণেই কন্‌ডম্ এত জনপ্রিয়।

মিলনশেষের পরীক্ষায় সঙ্গে সঙ্গেই সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ; অন্য কোন পন্থার কিন্তু এ সুবিধা নেই। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়, এজন্যে অবৈধ সংসর্গে, বিদেশে ও ভ্রমণে কন্‌ডম্‌ই একমাত্র বন্ধু। মধুযামিনীতেও অনেকটা তাই। কন্‌ডমের আশ্রয়ে ত্বরিতস্খলন বিলম্বিত হতে পারে। ঋতুমিলনেও এর দাম কম নয়। আর, রতিজ ব্যাধি সংক্রমণের ভয় থাকলে এটা ত' অবশ্য ব্যবহার্য।

কন্‌ডমের বিরুদ্ধে পুরুষদের প্রধান অসুবিধা বা অভিযোগ হল সুখানুভূতি কমে যাওয়া। নারীর বড় একটা অভিযোগ না থাকলেও কখন কখন স্ত্রীঅঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা হতে পারে। কন্‌ডম্ ঠিকমত উপায়ে

জেলী সহযোগে ব্যবহার করলে আবরণীর বাধাও থাকবে না, অনুভূতিও ততটা কমে যাবে না আর জ্বালাযন্ত্রণাও হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, স্বাভাবিক মিলনের মত ষোলআনা তৃপ্তি শুধু কন্‌ডমে কেন, কোন প্রয়োগসাপেক্ষ পদ্ধতিতে পাবেন না।

কোন কোন ক্লিনিক ও ডাক্তারেও কন্‌ডমে আপত্তি জানিয়েছে। এঁদের যুক্তি হল : স্ত্রীঅঙ্গে বীর্য শোষিত হতে পারে না, একারণে স্ত্রীর ক্ষতি হতে পারে ; সুখানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় অনুভূত না হওয়ার দরুন নানাবিধ মানসিক অশান্তি দেখা দিতে পারে; প্রষ্টেটগ্রন্থি বৃদ্ধি পেতে পারে ; ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, এগুলি অতিশয়োক্তি। বীর্যে কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ নেই, কোন হর্মোন নেই, নেই কোন উদ্দীপক পদার্থ, আছে শুধু কতকগুলি গ্রন্থির ক্ষরণ এবং বীর্যের একমাত্র কাজ হল ভ্রূণ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ বীর্য শোষিত হলেও যা, না হলেও ঠিক তাই। অতএব কন্‌ডম্ মিলনে বীর্যবঞ্চিতা নারীর কোন লোকসান নেই। তাছাড়া বীর্য আদৌ শোষিত হয় কি না, এ সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ আছে আর হলেও শুধু একারণে নারীর কল্যাণ সাধিত হয় না, হয় নিছক রতিতৃপ্তির জন্যে। অর্থাৎ বিবাহোত্তর দৈহিক উন্নতির জন্যে নিছক রতিতৃপ্তিই দায়ী, বীর্যশোষণ নয়। নিয়মিত কন্‌ডম্ ব্যবহারে প্রষ্টেটগ্রন্থি বৃদ্ধি পায় না। আর যদি কোন দম্পতি সর্বতোভাবে, যৌনতার দিক থেকে, মনের দিক থেকে ও উভয়ের তৃপ্তির দিক থেকে, কন্‌ডম্‌কে জন্মনিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন, দীর্ঘকাল ব্যবহারেও কোন কুফল দেখা দেবে না।

নির্ভরযোগ্যতা—ভাল কন্‌ডম্ ভাল জেলী দিয়ে ভাল মতে প্রয়োগ করলে, ভাল ফল সুনিশ্চিত। শুধু একক কন্‌ডমে ৭০%—৯০% সাফল্যলাভ। জেলীসিক্ত পন্থায় পরীক্ষিত কন্‌ডম্ ৯৮% নির্ভরযোগ্য।

নিক্ষেপকযন্ত্রযোগে জেলী আর কন্‌ডম্‌ যে অব্যর্থপ্রায় (প্রায় ১০০%) তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডায়াফ্রাম্‌
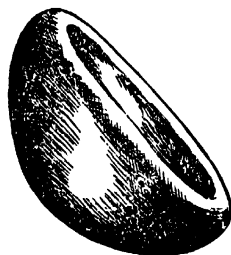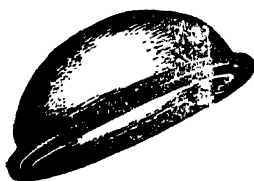
কি ও কেন?—ডায়াফ্রাম্‌টি আবরণী বিশেষ। ছোট ছেলেদের খেলার বল দ্বিখণ্ডিত করলে যে দু'টো টুকরো পাব তা দেখতে

২০-২৩নং ছবি—জরায়ুমুখের বিভিন্ন আবরণী

২০। ডায়াফ্রাম্‌ ২১। ডুমাস ক্যাপ্‌
২২। ভিম্‌মিউল ক্যাপ্‌ ২৩। সার্ভাইক্যাল্‌ ক্যাপ্‌

অনেকটা ডায়াফ্রামের মত। দ্বিখণ্ডিত বলের বাইরের দিকটা তরঙ্গায়িত এবং এটাই হল ডায়াফ্রামের ডোম বা বহির্গাত্র। আর

ভিতরের দিকটায় থাকে খানিকটা শূন্য জায়গা, এটাই হল ডায়াফ্রামের অন্তর্গাত্র। ডায়াফ্রমের রিমে বা গোল মুখেতে ধাতব স্প্রিং। এই স্প্রিংয়ের সবটাই রবারে ঢাকা থাকে। এই স্প্রিং আবার দু' ধরনের হতে পারে। একটিতে থাকে লম্বা চ্যাপ্টা ধরনের ঘড়ির স্প্রিং। আর এক ধরনের ডায়াফ্রামে থাকে কুণ্ডলীকৃত গোল স্প্রিং।

ডায়াফ্রাম্ অনেক মাপের আছে। সর্বনিম্ন মাপ হল ৫০ মিলি-মিটার আর সর্বোচ্চ ৯০ মিলিমিটার। একটি থেকে আরেকটির তফাত ৫ মিলিমিটার। অথবা ২½ মিলিমিটার। প্রথমটিরই চলন বেশী এবং এই হিসেবে (৫০, ৫৫, ৬০…৮০, ৮৫, ৯০) মোট ৯টি মাপের ডায়াফ্রাম্ই দেখতে পাওয়া যায়। আবার শেষোক্ত হিসেব মত ১৭টি সাইজেরও (৫০, ৫২½, ৫৫…৮৫, ৮৭½, ৯০) ডায়াফ্রাম্ পাওয়া যায়।
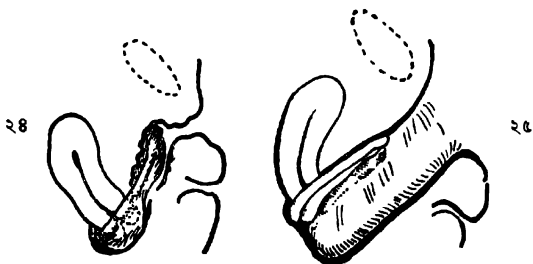
২৪ ও ২৫নং ছবি—মিলনপূর্বে ও মিলনকালে স্ত্রীঅঙ্গে উপযুক্ত মাপের ডায়াফ্রাম্

স্ত্রীঅঙ্গের শেষ প্রান্ত (নিম্ন ফর্ণিক্স) থেকে সামনের পিউবিক অস্থি পর্যন্ত জুড়ে থাকে ডায়াফ্রাম্ (২৪নং ছবি) এবং এই মাপ প্রত্যেক নারীর সমান নয় বলেই ডায়াফ্রাম্ও এত রকমারি মাপের। স্প্রিংয়ের টান, যোনিগাত্রস্থিত মাংসপেশীর চাপ এবং আবরণীগাত্রের বায়ুশূন্য

চোষণ—এই তিনের সামগ্রিক প্রভাবে আবরণীটি স্ত্রীঅঙ্গে এইভাবে লেগে থাকে। অর্থাৎ কিনা ডায়াফ্রাম্‌টি যোনিপথে পর্দা-বিশেষের কাজ করে। এই পর্দা দিয়েই স্ত্রীঅঙ্গটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পর্দার উপরে থাকে চুপ্‌সে যাওয়া স্বল্পপরিসর জায়গা। এই ঘেরাটোপের মধ্যেই থাকে জরায়ুমুখ আর স্ত্রীঅঙ্গের শেষপ্রান্ত থেকে যোনিমুখ বরাবর উপরিভাগের যোনিগাত্র। পর্দার নীচে পড়ে থাকে উন্মুক্ত ও বিস্তৃত পরিসর রমণপথ (২৫নং ছবি)। এই পথের শেষ প্রান্তে বীর্যস্খলিত হয়। আবরণী থাকার দরুন সরাসরি জরায়ুমুখে বীর্যপাত হতে পারে না আর সমস্ত শুক্রকীটও একযোগে ভিতরে যেতে পারে না। যদি কখনও কিছু শুক্রকীট ঢুকে পড়ে তাদেরকে বেশী পথ অতিক্রম করতে হবে এবং ডায়াফ্রামের ভিতরে শুক্রকীটধ্বংসী জেলীর সম্মুখীন হতে হবে। এই ভাবে ডায়াফ্রাম্‌ গর্ভাধান ঠেকিয়ে রাখে। সার্ভাইক্যাল্‌, ভুমাস ও ভিমিউল ক্যাপের কার্যকারিতার মূলসূত্রও ঠিক তাই।

আবরণী নির্বাচন—এখন আপনার জন্যে এই চারটির মধ্যে কোনটি লাগবে তার রায় দেওয়ার মালিক জন্মনিয়ন্ত্রণ বিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তার। আবার নির্বাচিত ক্যাপ্‌টির কোন সাইজ লাগবে তাও ঠিক করে দেবেন তিনিই। সোজা কথায় বই পড়ে বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে শুনে অথবা দোকানদারের কথামত নিজে নিজে এগুলি প্রয়োগ করবেন না। যদি কখনও এই স্ত্রী-পদ্ধতির অনুরাগী হয়ে ওঠেন, সোজা কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পারদর্শী ডাক্তারের চেম্বারে অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণ সংস্থায় হাজির হবেন।

স্ত্রীব্যবহৃত আবরণীর মধ্যে ডায়াফ্রাম্‌ই হবে প্রথম হাতিয়ার। কি ভারতীয় ডাক্তার, কি ভারতীয় নারী, প্রত্যেকেরই। স্ত্রীর ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্যেই হোক বা স্ত্রীঅঙ্গের কোন ত্রুটির জন্যেই

হোক, ডায়াফ্রাম্ যুক্তিযুক্ত না হলে ডুমাস কিংবা ভিমিউল ক্যাপ্ বেছে নিতে হবে। কোন কারণে শেষোক্ত ক্যাপ্ দু'টিতেও প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে, সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ই নির্দেশিত হয়ে থাকে। আবার সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ও অচল হলে, পুরুষের ক্যাপ্ অথবা অন্য কোন স্ত্রীসুলভ পদ্ধতিই একমাত্র সম্বল।

ডায়াফ্রাম্ শিক্ষা—প্রথমেই আপনাকে ডাক্তারের কাছে হাজির হতে হবে। তিনি আপনার কাছ থেকে আনুপূর্বিক ইতিহাস জেনে নেবেন এবং পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষার প্রথম ধাপই হল আপনার যোগ্যতার বিচার। ব্যক্তিগত দিক থেকে এবং আঙ্গিক সামঞ্জস্যের দিক থেকে আপনি স্ত্রী-পদ্ধতির উপযুক্ত হলেই এই পদ্ধতিটি পাবেন। তারপর কোনটি, ডায়াফ্রাম্ না অন্য ক্যাপ্, তার বিচার। সবশেষে সাইজ নির্ধারণ। ডায়াফ্রামের সতেরোটি বিভিন্ন সাইজ আছে; ডুমাস, ভিমউল ও সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপের যথাক্রমে পাঁচটি, তিনটি ও ছ'টি। একটির পর একটি পরিয়ে ঠিক করে নিতে হয় কোন সাইজটি আপনার জন্যে লাগবে। এখন প্রয়োগবিধি শেখার পালা। কেমন করে ডায়াফ্রাম্ ধরতে হয়, কি আসনে প্রয়োগ-পর্ব সহজ, কেমন করে পরিয়ে দিতে হয় আর কি ভাবে ও কখন বের করে আনতে হয় সবই শিখিয়ে দেবেন ডাক্তারবাবু। তারপর তিনিই হাতে কলমে সব দেখিয়ে দেবেন। এমনি করেই প্রতিটি প্রয়োগ-পর্ব আপনার করায়ত্ত হবে।

তারপর বাড়ীতে গিয়ে এটা অভ্যাস করতে হবে। কয়েকবার পরতে হবে আর খুলতে হবে যতক্ষণ না প্রয়োগ-বিধিতে আস্থা জন্মে। কয়েক দিন অভ্যাসের পর ডায়াফ্রাম্টি স্ত্রীঅঙ্গে লাগিয়ে ডাক্তারের কাছে আসতে হবে। ডায়াফ্রাম্ ঠিকমত লেগেছে, না এর চেয়েও একটু ছোট বা বা বড় সাইজের লাগবে তার নির্দেশ দেবে এই দ্বিতীয়

পরীক্ষা। আর ব্যবহারকারীর প্রয়োগ-দক্ষতারও পরিচয় মিলবে এবং কোথাও কোন ত্রুটি থাকলে তার সংশোধনও সম্ভব এই দ্বিতীয় পরীক্ষায়।

এর পরেও আর একদিন ডাক্তারের কাছে আসতে পারলে খুবই ভাল হয়। মিলনকালে কোন অসুবিধা হয় কিনা এবং ডায়াফ্রামটি ঠিক জায়গায় থাকে, না এদিক ওদিক সরে যায় তারই নির্দেশ দেবে এই তৃতীয় ও শেষ পরীক্ষা। যে রাত্রে মিলিত হবেন, তার পরের দিন ডাক্তারের কাছে এলেই এ তথ্যটি জানা যাবে। বলাই বাহুল্য যতদিন না ডায়াফ্রাম্ ঠিকমত বুঝে নেওয়া হচ্ছে (অর্থাৎ এই তিনটি পরীক্ষা পর্যন্ত) ততদিন স্বামীকে কন্‌ডম্ প্রয়োগ করতে হবে।
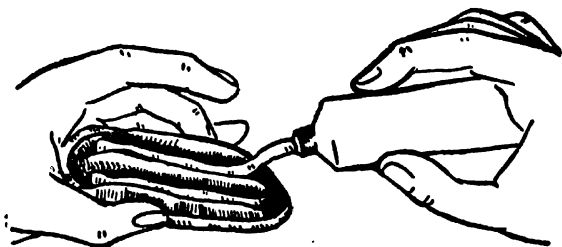
২৬নং ছবি—ডায়াফ্রামে জেলী প্রয়োগ

একবার ডাক্তার দেখিয়ে ফিট করিয়ে নিলে, অপর একটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত এই মাপের ডায়াফ্রামেই কাজ চলে। কিন্তু আর একটি সন্তান হলে (এমন কি গর্ভপাতও) এবং বিয়ের পরই ডায়াফ্রাম্ পরিয়ে নিলে, পুনরায় ডাক্তারের কাছে আসতে হবে। স্ত্রীঅঙ্গের তথা ডায়াফ্রামের মাপটি ছোট বড় হতে পারে বলেই এই সতর্কতা।

সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ এবং ভুমাস, ভিমিউল ক্যাপের ক্ষেত্রেও এই একই শিক্ষা, এই একই নিয়ম।

ব্যবহার বিধি—ডায়াফ্রামের ডোমটি উপরে (কখনবা নীচে) রেখে নিজের সুবিধামত যে কোন সময়ে প্রয়োগ করা চলে। প্রয়োজনের সময় কিংবা কিছুক্ষণ অথবা দু'চার ঘণ্টা আগে। আবার রুটিনমাফিক প্রতিটি রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে অঙ্গরাগের সময় কিংবা প্রতিটি সন্ধ্যায় অঙ্গপ্রসাধনের সময় পরে নিতে পারেন। ব্যবহারের সময় বাথরুম ঘুরে আসতে হবে, মূত্রত্যাগের উদ্দেশ্যে এবং হাত পরিষ্কার করার জন্যে। এখন ডায়াফ্রামে জেলী প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমেই ডায়াফ্রামের যে দিকটা জরায়ুর সঙ্গে লেগে থাকবে অর্থাৎ ডায়াফ্রামের ডোমে লম্বালম্বিভাবে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুটো জেলীরেখা (অথবা এক চা-চামচ পরিমিতি জেলী) টেনে দিন। তারপর ডায়াফ্রামের ভিতরে ও রিমে জেলী মাখিয়ে নিতে হবে।
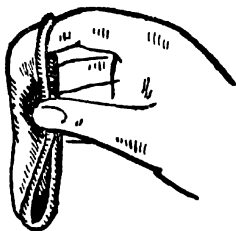
২৭নং ছবি—ডায়াফ্রাম্ ধারণ

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির সাহায্যে ডায়াফ্রাম্টির মাঝখানে ধরুন এবং সামনের রিমটি তর্জনী দিয়ে ধরলেই এটা স্থিরবদ্ধ হয়ে থাকবে। এখন, শায়িত অবস্থায়, দণ্ডায়মান অবস্থায়, এক পা চেয়ারে রেখে কিংবা গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসা অবস্থায়, পছন্দমত যে কোন একটি আসনে ডায়াফ্রাম্টি প্রয়োগ করতে হবে।

এক হাতে জেলীসিক্ত ডায়াফ্রাম্ ধারণ, অন্য হাতের দু' আঙ্গুল দিয়ে যোনিমুখ সম্প্রসারণ, তারপর প্রসারিত যোনিমুখে ডায়াফ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তটি স্থাপন। এখন স্ত্রীঅঙ্গের নীচের দেয়াল ঘেঁসে নীচের দিকে (শায়িত অবস্থায়) কিংবা উপরের দিকে (অন্য আসনে) আস্তে আস্তে এটা ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এইভাবে

প্রায় সবটা ভিতরে চলে গেলে, হাতের চাপ বা মুঠি ছেড়ে দিলেই ডায়াফ্রাম্‌টি আপনাআপনি লেগে যাবে। এখন সামনের প্রান্তটি
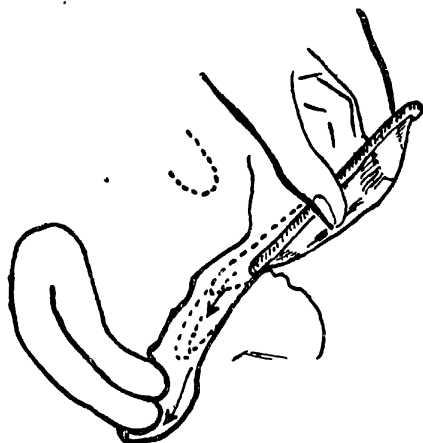
২৮নং ছবি—ডায়াফ্রাম্‌ প্রয়োগ

আঙ্গুলের ডগা দিয়ে উপরে (অর্থাৎ পিউবিক অস্থির নীচে) ঠেলে দিতে হবে। সবশেষে, জরায়ু-মুখের পরীক্ষা। একটা আঙ্গুল ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিন, রবারের মধ্য দিয়ে একটা শক্ত গোল মত জিনিস (জরায়ুগ্রীবা) হাতে ঠেকলেই বুঝবেন ডায়াফ্রাম্‌টি ঠিক মত পরানো হয়েছে। আর যদি দেখেন রবারের মধ্য দিয়ে হাতে কিছু
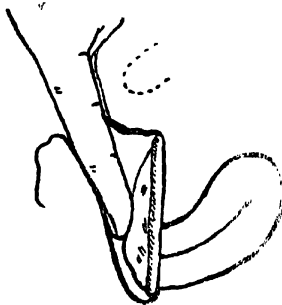
২৯নং ছবি—জরায়ুমুখের পরীক্ষা

ঠেকছে না, ডায়াফ্রামের সবটাই খুলে ফেলে আবার নতুন করে প্রয়োগ করতে হবে। হাত দিয়ে চেপে ধরে ডায়াফ্রাম্ প্রয়োগে কোন অসুবিধা হলে প্রবেশকযন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এই যন্ত্রটির একদিকে খাঁজ কাটা আর কিছুদূর পিছিয়ে একটা বেতামের মত উঁচু জায়গা। যন্ত্রের এই দুটি অংশে ডায়াফ্রামের প্রান্ত দুটি লাগিয়ে উপরোক্ত উপায়ে জেলী মাখিয়ে ডায়াফ্রামটি প্রয়োগ করতে হবে। বাঁদিকে কিংবা ডানদিকে একটু ঘুরিয়ে দিলেই দিলেই প্রবেশকযন্ত্রটি ডায়াফ্রাম্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।
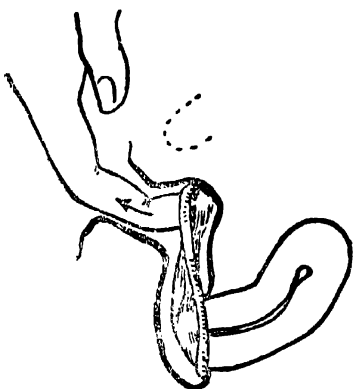
৩০নং ছবি—ডায়াফ্রামের বহিষ্করণ

অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে মিলনপূর্বে (কিংবা মিলনশেষে) নিক্ষেপক-যন্ত্রযোগে জেলী কিংবা ট্যাবলেট প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। একই রাত্রে দ্বিতীয়বার মিলিত হলে, এই ভাবে জেলী কিংবা ট্যাবলেট প্রয়োগ করতে হবে।

একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টার বেশী ডায়াফ্রামটি স্ত্রীঅঙ্গে রেখে দেওয়া উচিত নয়। আর শেষ মিলনের পর ছ' ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টার মধ্যে ডায়াফ্রাম্ খুলে ফেলাই নিয়ম। ডুশের কোন প্রয়োজন নেই। তবে মিলনশেষে কিংবা ছ' ঘণ্টার আগে যদি ডায়াফ্রাম্ খুলে ফেলতে চান, ডুশ নিতেই হবে।

খুলে ফেলার সময়, যে আসনে ডায়াফ্রাম্ প্রয়োগ করেছেন পুনরায় সেই আসন গ্রহন করুন। তারপর একটা আঙ্গুল স্ত্রীঅঙ্গে উপরের দিকে একটু (এই এক ইঞ্চি কি দু' ইঞ্চির মত) প্রবেশ করিয়ে দিন এবং ডায়াফ্রামের রিমটাকে আঁকশির মত আঙ্গুল দিয়ে ধরুন। এখন নীচের দিকে টান দিলেই এটা বেরিয়ে আসবে।

যত্ন—খুলে নেওয়ার পর ডায়াফ্রাম্‌টি ধুয়ে মুছে পাউডার লাগিয়ে বাক্সের মধ্যে রেখে দিতে হবে। মাঝে মাঝে ডায়াফ্রামের মধ্যে জল ভর্তি করে দেখে নেবেন অন্য দিক থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে কিনা। ফুটো-ফাটা থাকলে, রবারটি দুর্বল হলে কিংবা স্প্রিংয়ের সম্প্রসারণশীলতা নষ্ট হয়ে গেলে, নতুন একটা ডায়াফ্রাম্ কিনতে হবে। ডায়াফ্রামের সংরক্ষণ এবং কোন জাতীয় দ্রব্যাদির প্রয়োগ নিষিদ্ধ তা জানার জন্যে ৬৯ ও ৭০ পৃষ্টা দেখুন।

সুবিধা ও অসুবিধা—একটি ডায়াফ্রাম্ অনায়াসে এক থেকে দু'বছর কার্যকরী থাকে, তাই খরচের দিক থেকে ডায়াফ্রাম্ পদ্ধতিটি খুবই সস্তা। আরেকটি মস্ত বড় সুবিধা যে রতিকালীন কোন প্রস্তুতি নেই, নেই কোন অতৃপ্তি। আর পদ্ধতিটি নারী-নির্ভর হওয়ায় সাফল্যলাভও একটু বেশী। পদ্ধতিটির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল যে ডাক্তার না দেখিয়ে এমন সুন্দর পন্থায় হাত দেবার জো নেই।

নির্ভরযোগ্যতা—বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহৃত ডায়াফ্রাম্ নিঃসন্দেহে নিরাপদ ও ক্ষতিশূন্য। শুধু তাই নয়, নির্ভরসুদৃঢ়ও বটে। জেলীসিক্ত ডায়াফ্রামে ৯৮% সাফল্যলাভ। আর পূর্ণ মাত্রার জেলী প্রয়োগে শতকরা প্রায় শতটি ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ একেবারে অসম্ভব নয়।

সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্

কি ও কেন ?—সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ জরায়ুমুখের ছোট্ট আবরণী বিশেষ। দেখতে ছোট বাটির মত। ডায়াফ্রামের মতই এর ডোম ও রিম আছে। তবে ডোমটি বেশ উঁচু আর রিমটি একটু শক্ত। এর বাইরের দিকটা দেখতে অনেকটা গম্বুজের মত ; ভিতরের দিকটায় থাকে খানিকটা শূন্য জায়গা, এর মধ্যেই জরায়ুগ্রীবা থাকে।

৩১। হাইজিবী ক্যাপ্

৩২। কাইজার ক্যাপ্

৩৩। প্লাষ্টিক সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্

৩৪। কাফকা ক্যাপ্

৩১-৩৪নং ছবি—কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্

মারী ষ্টোপ্সের প্রচেষ্টা ও জীবনব্যাপী সাধনার ফলে আজ এই ক্যাপ্টি পৃথিবী বিখ্যাত। বলাই বাহুল্য এঁর রেসিয়্যাল ক্যাপ। সবচেয়ে ভাল সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্। আমাদের দেশে চেক পেসারী নামেই এটা বেশী পরিচিত।

জরায়ুগ্রীবায় অবস্থিতিভেদে সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ দু'রকমের :

এক, পোর্শিয়া ধরনের ক্যাপ্ (৩১, ৩২ ও ৩৪নং ছবি)। ক্যাপ্টি জরায়ুমুখ ও জরায়ুগ্রীবার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। অনেকটা দর্জিদের

হাতে অঙ্গুস্তানা লেগে থাকার মত। ইউরোপে, বিশেষ করে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে, এটা অতি আদরের। দেখতে ছোট বাটির মত। কোন রিমও নেই, কোন সুতোর বন্ধনীও নেই। কোন একটা শক্ত পদার্থ দিয়ে এটা তৈরী আর একাদিক্রমে এক মাসের মত (কোথাও আরও বেশী) স্ত্রীঅঙ্গে রেখে দেওয়া যায়। ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বলেই এ জাতীয় ক্যাপ্ কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

৩৫। বাইমেষ্টন ক্যাপ্

৩৬। খাঁজকাটা রিমযুক্ত ক্যাপ্

৩৭। বায়ুপূরিত রিমযুক্ত ক্যাপ্

৩৮। স্পঞ্জের চেক পেসারী

৩৫-৩৮নং ছবি—বিভিন্ন ধরনের অক্লুসিভ ক্যাপ

দুই, অক্লুসিভ্ ধরনের ক্যাপ। জরায়ুগ্রীবা ও যোনিগাত্রের সংযোগস্থলে ক্যাপের রিমটি লেগে থাকে। ক্যাপ্‌টি কোথাও জরায়ু-

গ্রীবার গাত্র স্পর্শ করে না অথচ জরায়ুমুখ পুরোপুরি ঢেকে রাখে। সাধারণত এই ক্যাপ্ রবারের তৈরী এবং ২৪ ঘণ্টার বেশী স্ত্রীঅঙ্গে রেখে দেওয়া হয় না। কিন্তু প্লাষ্টিকের সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ দীর্ঘমেয়াদী (এক মাস) হয়েও অক্লুসিভ্ গোষ্ঠীভুক্ত (৩৩নং ছবি)।

অক্লুসিভ্ ধরনের সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ও অনেক রকমের হতে পারে। এদের মধ্যে উঁচু ডোম ও শক্ত রবারের রিমযুক্ত রেসিয়্যাল ক্যাপ্ই সমধিক প্রচলিত (২৩নং ছবি)। ডোমটি কোথাও নীচু, কোথাও-বা ভিতরে ছোটখাটো পকেট বা গর্তের মতনও থাকে (৩৫নং ছবি)। কোথাও রবারের রিমের বদলে স্প্রিং, কোথাও-বা রিমটি শুধু হাওয়া দিয়ে ভর্তি করা থাকে (৩৭নং ছবি)। কোথাও দু'দুটো রিম এক সঙ্গে লাগান থাকে, কোথাও রিমে খাঁজ কাটা থাকে (৩৬নং ছবি)। কখন বাইরে স্পঞ্জ লাগান থাকে, কখন-বা স্পঞ্জ কেটে সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপের সৃষ্টি (৩৮নং ছবি)।

শুধু বায়ুশূন্য প্রভাবের ফলেই সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্টি সরাসরি জরায়ুগ্রীবায় লেগে থাকে। এটি ডায়াফ্রামের মত স্ত্রীঅঙ্গ নির্ভর নয়। তাই, ডায়াফ্রামের নিষিদ্ধক্ষেত্রে এদের নির্দেশ দেওয়াই নিয়ম। এই ক্যাপ্ও অনেক মাপের হতে পারে। আমাদের দেশে ডুরেক্স কোম্পানির তৈরী ছ'টি বিভিন্ন মাপের (০০, ০, ½, ১, ২, ৩) ক্যাপ্ পাওয়া যায়। রেসিয়্যাল ক্যাপ্ (০, ১, ২, ৩) চারটি মাপের হয়।

ব্যবহার বিধি—ডায়াফ্রাম্ প্রয়োগের জন্যে যে তিনটি সময় ও যে তিনটি আসনের কথা বলেছি এবং খুলে ফেলার সময় ও ডুশ সম্বন্ধে যা বলেছি তার সবই সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপে প্রযোজ্য। ক্যাপ্ প্রয়োগের আগে সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর ক্যাপের ভিতরে জেলী ঢালুন যতক্ষণ না অর্ধেকটা জেলী ভর্তি হচ্ছে। এখন

ক্যাপের রিমে ও বাইরে জেলীসিক্ত করে নিতে হবে। জেলী মাখিয়ে মনোমত আসনে ক্যাপের খোলা মুখটি আঙ্গুল দিয়ে ধরে স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করাতে হবে। আস্তে আস্তে নীচের দেয়াল ঘেঁসে ভিতরে প্রবেশ করাতে করাতে জরায়ু-মুখের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে আঙ্গুলের চাপটা ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

৩৯নং ছবি—সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ ধারণ

ক্যাপ্‌টা ছিটকে গিয়ে জরায়ুগ্রাবায় লেগে যাবে। সব শেষের কাজটি হল ক্যাপ্‌টি উপরের দিকে ঠেলে ঠেলে জরায়ুগ্রীবায় ভাল করে বসিয়ে দেওয়া।
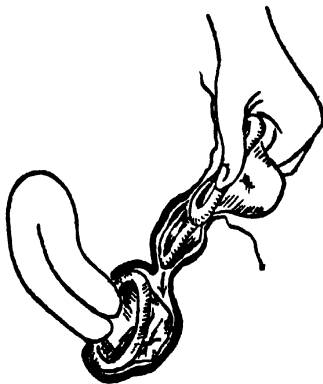
৪০নং ছবি—সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ প্রয়োগ

একই রাত্রে পুনরায় মিলিত হলে এবং অধিকতর নিরাপত্তাকামী হলে মিলনের অব্যবহিত পূর্বে কোন জেলী বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করতে হবে। এতে অসুবিধা হলে, ঠিক স্খলনের পরই প্রয়োগ করতে পারেন।

এখন কি করে ক্যাপ্‌টি খুলে নিতে হবে তারই কথা বলব। গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসা অবস্থায় একটা আঙ্গুল স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দিন এবং জরায়ুগ্রীবার মূলে রিমটি ধরুন। এখন এটাকে একটু নীচের দিকে টানতে থাকুন যতক্ষণ না ভিতরের বায়ুশূন্য

৪১নং ছবি—সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপের বহিষ্করণ

প্রভাবটি নষ্ট হয়। এটা নষ্ট হলেই ক্যাপ্‌টি নীচের দিকে ঝুলে পড়বে, তখন দু আঙ্গুল দিয়ে ধরে বের করে আনতে হবে। সুতোয় টান

দিয়ে ক্যাপ্ খোলার পক্ষপাতী নই, তাই ক্যাপে সুতো থাকলে, সুতোটা কেটে ফেলে দিতে হবে।

সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপের যত্ন ও পরিচর্যা এবং সুবিধা ও অসুবিধা ডায়াফ্রামের মতই। এর সব চেয়ে বড় অসুবিধা হল যে মিলনকালে ক্যাপ্‌টি খসে যেতে পারে আর জরায়ুর সব অবস্থাতেই (জরায়ুগ্রীবার দোষ ত্রুটিতে) প্রয়োগ করা যায় না।

পোর্শিয়া ধরনের ক্যাপে ক্ষতির সম্ভাবনা ষোল আনা। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রে নরম রবারের (কিংবা প্লাষ্টিকের) ক্যাপ্ নিঃসন্দেহে ক্ষয়ক্ষতিলেশশূন্য। নির্ভরযোগ্যতায় ডায়াফ্রামের সমতুল্য সাফল্য-লাভ নিঃসন্দেহে সম্ভবপর।

ভুমাস ও ভিমিউল ক্যাপ্ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যবহার বিধি প্রযোজ্য। এত্নটি ক্যাপের ক্ষেত্রেও কোন ক্ষতি বা কুফল দেখা দেয় না এবং ডায়াফ্রাম্ বা সার্ভাইক্যাল ক্যাপের মতই নির্ভরযোগ্য।

রাসায়নিক পদ্ধতি

কি ও কেন ?—আবরণীর বাঁধন দেব না অথচ শুক্রকীটগুলি হাতের মুঠোয় রাখব তার সোজা উপায় হল এগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা। এই উদ্দেশ্যে স্ত্রীঅঙ্গে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য (জেলী, সাপোজিটারী, ট্যাবলেট, ডুশ ইত্যাদি) প্রয়োগের চলন আছে। রাসায়নিক প্রভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ঘটে বলেই, এদের নাম রাসায়নিক পদ্ধতি।

প্রায় শতবর্ষ আগে জার্মানীর কাছ থেকে ট্যাবলেট ও জেলীর সন্ধান পেয়েছি। তখনকার দিনে এই পদ্ধতিতে বড্ড বেশী ব্যর্থতা দেখা দিত বলেই রাসায়নিক পদ্ধতিগুলি আবরণী সহযোগে ব্যবহৃত হতে থাকল, অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে। এই আবরণী তথা ডায়াফ্রাম্ যুগেরই কোন এক সময়ে রাসায়নিক পদ্ধতিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, নতুন রাসায়নিক তথা জেলী যুগের পত্তন হল। এটা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের প্রগতির দৌলতেই। ইদানীংকালে রাসায়নিক দ্রব্যের শুক্রকীট-নাশকতা শক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রয়োগমাত্রই স্ত্রীঅঙ্গের প্রতিটি খাঁজে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে শুক্রকীট কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া রাসায়নিক দ্রব্যের চটচটে ও আঠাল ভাবটা দ্বিগুণিত করা হয়েচে, এতে চলমান শুক্রকীট স্থাণু মেরে যায়। আর তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ার জন্যে এবং যেখানে ছড়িয়ে পড়বে সেখানে আঠার মত লেগে থাকার জন্যে এই রাসায়নিক পদ্ধতিটির আরেকটি কার্যক্ষমতা সংযোজিত হয়েছে। এটা হল জরায়ুমুখের সামনে একটা চটচটে আঠাল পর্দার আবির্ভাব। অর্থাৎ শুক্রকীটগুলি বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জরায়ুমুখের সামনে অকৃত্রিম আবরণীর আবির্ভাবই হবে রাসায়নিক পদ্ধতিগুলির প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটি

যে রাসায়নিক দ্রব্যে অতিমাত্রায় কার্যকরী থাকবে, তা একক প্রয়োগ করা যাবে, এমন কি কোন আবরণীর আশ্রয় না নিয়েও। উপরোক্ত গুণগুলির কম বা বেশী প্রায় প্রত্যেকটি জেলীরই আছে এবং জেলীর মধ্যে প্রিসেপ্টিন্ জেল্, কোরোমেক্স জেলী, কণ্টাব জেলী একক প্রয়োগের জন্য শ্রেষ্ঠ।

সুবিধা ও অসুবিধা—রাসায়নিক পদ্ধতিগুলির এত অজস্র সুখ সুবিধা আছে যে শোনা মাত্রই এর ভক্ত হয়ে পড়ে অনেকেই। জলের মত সহজ, যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। কোন ডাক্তার দেখানোর হাঙ্গামা নেই, কোন বিদ্যেবুদ্ধির দরকার নেই। অন্যান্য পদ্ধতির মত প্রস্তুতি নেই। নেই কোন আবরণীর অস্বস্তি। আর পূর্ণ রতিতৃপ্তিতেও কোন প্রতিবন্ধক নেই। এর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল ব্যয়বহুলতা। জেলীতে অতিপিচ্ছিলতা কিংবা চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসার অস্বস্তি হতে পারে; ট্যাবলেটে কখন কখন স্ত্রীঅঙ্গে বা পুরুষাঙ্গে জ্বালা পোড়ার মত অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে; সাপোজিটারীতে অতি তৈলাক্তভাব কিংবা কাপড়ে দাগ লাগতে পারে।

কাদের জন্যে ?—আবরণীমূলক পদ্ধতি কোন কারণে নিষিদ্ধ হয়ে পড়লে অন্যতম পথ হিসেবে খোলা থাকে রাসায়নিক পদ্ধতিগুলি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল অভাবের সময় আর বিপদকালে, জরুরী ব্যবস্থার প্রতিষেধক হিসেবে।

কোথায় নয় ?—অপরিহার্য জন্মরোধের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বৈত পন্থা হিসেবে (অর্থাৎ আবরণী সহযোগে) ব্যবহার করাই উচিত। অতি উর্বরা নারী এবং বহু প্রসবিনীদের ক্ষেত্রেও তাই। মধুযামিনীতে কোন ট্যাবলেট বা সাপোজিটারী প্রয়োগ না করাই ভাল।

নির্ভরযোগ্যতা—রাসায়নিক পদ্ধতিগুলি আদৌ ক্ষতিকারক নয়। দীর্ঘকালীন প্রয়োগ সত্ত্বেও কোন ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন দেখা দেবে না।

আর কিছুটা নির্ভরযোগ্যও বটে। কোরোমেক্স জেলী ও প্রিসেপ্টিন্ জেলের নির্ভরযোগ্যতা ৯০% আর অন্যান্য জেলী, ট্যাবলেট ও সাপো-জিটারীর সাফল্যহার গড়ে ৮০ %এর উপরে। অতএব, প্রিসেপ্টিন্ জেল্, কোরোমেক্স জেলী ব্যতিরেকে অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্যের একক প্রয়োগের পক্ষপাতী নই। অন্যান্য দ্রবাদি শুধু আবরণী সহযোগে সমর্থনযোগ্য আর আবরণী প্রয়োগে যেখানে দুস্তর বাধা, সেখানে দায়ে পড়েই এদের একক প্রয়োগ সমর্থন করতে হবে। কেননা কিছুই প্রয়োগ না করার চেয়ে কোন কিছু অর্থাৎ প্রিসেপ্টিন্ ব্যতিরেকে অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে গর্ভনিরাপত্তা যেটুকু আসবে সেটাই ত' মস্ত লাভ।

কোনটি ?—এখন প্রশ্ন হল : রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে কোনটি বেছে নেব ? এর সোজা জবাব হল : জেলীই বেছে নেবেন। কেননা, জেলী (কিংবা ক্রীম), সাপোজিটারী এবং ট্যাবলেট, এদের মধ্যে জেলীই শ্রেষ্ঠ। কার্যকারিতার জন্যে ট্যাবলেট সময়, চাপ ও আর্দ্রতা নির্ভর ; সাপোজিটারী সময় ও তাপের অধীন ; এবং এজাতীয় কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নয় বলেই জেলী শীর্ষস্থানীয়। আর ডুশ অধ্যায়ে বর্ণিত মারাত্মক ত্রুটি দুটির জন্যে ডুশ সমর্থনযোগ্য নয়।

অতএব রাসায়নিক পদ্ধতি নির্বাচনে, কি একক পদ্ধতির জন্যে, কি আবরণী সহযোগে দ্বৈত পদ্ধতির জন্যে, জেলী কিংবা ক্রীমই একমাত্র উত্তর। জেলীর মধ্যে প্রিসেপ্টিন্ জেল্, ভলপার পেষ্ট, কোরেমেক্স জেলী বা ক্রীম, অর্থোগোইনল জেলী বা ক্রীম, কুপার জেল্ বা ক্রীম, ডুরাক্রীম, পেটেণ্টেক্স জেলী, কণ্টাব জেলী বা ক্রীম, প্রটেক্টো জেলী, প্রয়োজন এবং পছন্দ মত যে কোনটি কিনতে পারেন। জেলীতে অতি পিচ্ছিলতা (ভলপার এবং প্রিসেপ্টিন্ জেলের পিচ্ছিলতা গুণটি নেই) ভাব দেখা দিলে ক্রীম ব্যবহার করতে হবে। আর জেলী বা

ক্রীমেও অসুবিধা হলে ট্যাবলেটই একমাত্র আশ্রয়। আমাদের দেশে নির্ভরযোগ্য স্যাপোজটারী পাওয়া যায় না, তাই। ট্যাবলেটের মধ্যে ডুলপার ফোমিং ট্যাবলেট, গাইনোমিন, স্পিটন, কণ্টাব, পছন্দমত যে কোনটি ব্যবহার করতে পারেন।

জেলী

জেলী নরম, তলতলে, ক্বাথ জাতীয়, তাই একটি পাত্রে থাকে। এই আধারটি হল টিউব। ছিপি খুলে টিউবে একটু চাপ দিলে (কোথাও চাবি ঘুরিয়ে) গন্ধহীন বা সুরভিত পিচ্ছিল জেলী বেরিয়ে আসবে, এই জেলী দেখতে অনেকটা দাঁতমাজার পেষ্টের মত। কোনটির রং সাদা দুধের মত, ফিকে সবুজ বা হলদেটেও হতে পারে। পেষ্ট, ক্রীম ও জেল্ পিচ্ছিল নয় এবং অয়েণ্টমেণ্ট একটু তৈলাক্ত হতে পারে। এই একই জেলী, উপকরণের বৈচিত্র্যভেদে কোথাও হয়েছে ক্রীম, কোথাও পেষ্ট কিংবা জেল, কোথাও-বা অয়েণ্টমেণ্ট।

এক একটি টিউবে সাধারণত তিন চার আউন্স (১২-১৬) বার প্রয়োগের জন্যে জেলী ধরে। জেলী স্বভাবতই নরম, তাই একটা কিছু দিয়ে স্ত্রীঅঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। এরই নাম নিক্ষেপক-যন্ত্র। অধিকাংশ জেলীরই টিউব ও নিক্ষেপক-যন্ত্রটি স্বতন্ত্র; কোন কোন জেলীতে এ দু'টি অবিচ্ছেদ্য। শেষোক্ত ধরনের যন্ত্রে জেলী শুকিয়ে থাকে এবং পরিষ্কার করাও যায় না। এজন্যে স্বতন্ত্র নিক্ষেপক-যন্ত্রেরই আমরা পক্ষপাতী। আমাদের দেশে দু' রকমের নিক্ষেপক-যন্ত্র দেখা যায়। প্রথমটি হল নজল্ জাতীয়। যন্ত্রটি বেশ ছোটখাটো, কোন ধাতুর তৈরী আর যে মুখ দিয়ে জেলী বেরিয়ে আসে সেটা সরু ও অনেকটা ছুঁচলো গোছের। এতে চোট লাগতে পারে এবং মূত্রনালীমুখ ও জরায়ুমুখে জেলী চলে যাওয়ার

আশঙ্কা থাকে বলেই এজাতীয় নিক্ষেপক-যন্ত্র ব্যবহার না করাই উচিত।
দ্বিতীয়টি হল পিষ্টন জাতীয়। এটি সাধারণত প্লাষ্টিকের তৈরী, দেখতে ভারী সুন্দর। বেশ লম্বা এবং জেলী বেরিয়ে আসার মুখটাও বেশ মোটা ও ভোঁতা। একটি ফাঁপা নল (খোল) ও একটি নলচের (পিষ্টন) সমন্বয়ে এই যন্ত্রটি তৈরী। এই যন্ত্রে পাঁচ সি. সি. অথবা এক চা-চামচের মত জেলী ধরে। বলাই বাহুল্য, এ ধরনের নিক্ষেপক-যন্ত্রই ব্যবহারযোগ্য।

আমাদের দেশে যে জেলী পাওয়া যায় তা দু'রকমের। এক, সাধারণ জেলী। কোন না কোন আবরণীর (কন্‌ডম, ডায়াফ্রাম্, স্পঞ্জ ইত্যাদি) সঙ্গে প্রয়োগের জন্যেই এই জেলী। দুই, বিশেষ
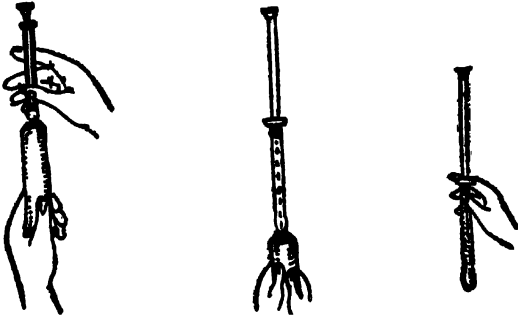
৪২নং ছবি—জেলী টিউবে নিক্ষেপক-যন্ত্র স্থাপন ৪৩নং ছবি—নিক্ষেপক-যন্ত্রে জেলী সঞ্চার ৪৪নং ছবি—জেলী-পূর্ণ নিক্ষেপক-যন্ত্র ধারণ

ধরনের জেলী—প্রিসেপ্টিন্ জেল্, কোরোমেক্স জেলী বা ক্রীম, কণ্টাব জেলী বা ক্রীম—শুধুই জেলী সহযোগে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে।

নিছক পিচ্ছিলতার জন্যেও জেলী ব্যবহৃত হতে পারে। আর জরুরী ব্যবস্থার প্রতিষেধক হিসেবে রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে জেলীই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই জেলী পদ্ধতির জন্যে চাই এক টিউব জেলী আর একটি পিষ্টন জাতীয় নিক্ষেপক-যন্ত্র। এখন কি করে জেলী প্রয়োগ করতে হবে তারই কথা কথা বলব :

● প্রয়োগকারী—স্বামী দু' চার বার দেখিয়ে দিলেই স্ত্রী শিখে নেবে। স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ জেলী প্রয়োগ করতে পারে।

● নিক্ষেপক-যন্ত্রে জেলী সঞ্চার—জেলী-টিউবের মুখের ছিপি খুলে নিক্ষেপক-যন্ত্রটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগান (৪২নং ছবি)। এই টিউবের নীচের দিকে দু' আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিন, যতক্ষণ না যন্ত্রটির সবটাই জেলীতে ভর্তি হয়ে যায় (৪৩নং ছবি)। এখন যন্ত্রটি খুলে রাখুন আর টিউবের মুখে ছিপিটি এঁটে দিন। প্রয়োজন হলে, নিক্ষেপক-যন্ত্রের বাইরে একটু জেলী লাগিয়ে পিচ্ছিল করে নিতে পারেন।

● আসনভঙ্গী—হাঁটু মুড়ে, পা দুটো একটু ফাঁক করে, স্ত্রীকে চিত হয়ে শায়িত হতে হবে (৪৫নং ছবি)।

● জেলী প্রয়োগ—এক হাতে জেলী ভর্তি নিক্ষেপক-যন্ত্র ধারণ (৪৪নং ছবি), অন্য হাতে যোনিমুখ সম্প্রসারণ, তারপর প্রসারিত যোনিমুখে নিক্ষেপক-যন্ত্রটির স্থাপন। এখন এই যন্ত্রটি আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে, নীচের দেয়াল ঘেঁসে নীচের দিক বরাবর প্রবেশ করাতে থাকুন (৪৫নং ছবি)। যখন দেখবেন আর ভিতরে যাচ্ছে না, জেলীর সবটাই ঠেলে দিন।

● প্রয়োগ কাল—শৃঙ্গার শুরু হওয়া মাত্রই কিংবা অঙ্গসংযোগের অব্যবহিত পূর্বে জেলী প্রয়োগ করতে হবে। আর ডায়াফ্রাম্ প্রভৃতি

স্ত্রী-নির্ভর আবরণী সহযোগে ব্যবহৃত হলে মিলনের মধ্য পথে এমন কি মিলন শেষেও জেলী প্রয়োগ করা যায়।

● প্রয়োগ সংখ্যা—প্রতিটি মিলনের জন্যে প্রতিটি জেলী প্রয়োগ। একই রাত্রে দু'বার মিলিত হলে দু'বার জেলী প্রয়োগ এবং প্রত্যেক বারই নিক্ষেপক-যন্ত্রের সবটাই জেলী-ঠাসা হওয়া চাই।

● প্রয়োগোত্তর নিশ্চলতা—সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সেরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জেলী প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ জেলী প্রয়োগের পর কোন রকম চলাফেরা বা বাথরুমে যাওয়া চলবে না।
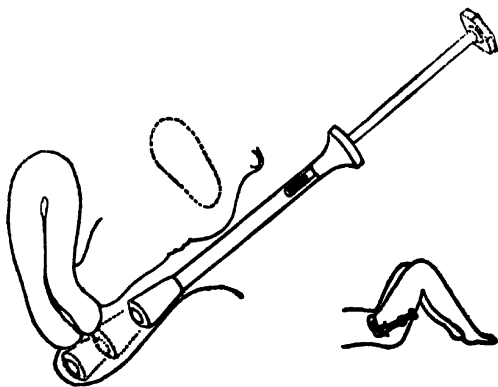
৪৫নং ছবি—জেলী প্রয়োগ

● ডুশ অনাবশ্যক—মিলনশেষে কোন রকম আভ্যন্তরীণ ধোয়া-মোছা, ডুশ নেওয়া বা কোঁত দিয়ে বীর্য বা জেলী বের করে দেওয়ার চেষ্টা অনাবশ্যক। অবশ্য বহির্যোনি পরিষ্কার করাতে কোন আপত্তি নেই।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি পরের দিন সকালে এ সব পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হয়। অর্থাৎ যা কিছু ধোয়া-মোছা সবই শেষ মিলনের ছ' থেকে আট ঘণ্টা পরে। এমন কি ছ'ঘণ্টা পরেও ডুশ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা জেলীর সবটাই আপনাআপনি বেরিয়ে আসবে। সাধারণত সকালে বিছানা ছেড়ে চলাফেরার সময় জেলীর প্রায় সবটাই বেরিয়ে আসে। এর পরেও যদি চুঁইয়ে চুঁইয়ে জেলী বেরিয়ে আসে একখণ্ড পরিষ্কার নরম কাপড় বা কিছুটা তুলো দুই উরুর মাঝে অথবা যোনিমুখে স্থাপন করতে পারেন। আর মিলনশেষেও যদি এমনটি হয় এই একই কথা।

● নিক্ষেপক-যন্ত্রের যত্ন—এটি পরের দিন পরিষ্কার করলেই চলবে। নলচেটির মাথার দিককার প্যাঁচটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে ফেললেই যন্ত্রটি তিনটি বিভিন্ন অংশে (খোল, নলচে ও নলচের মাথা) বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি ঠাণ্ডা জল ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করুন। ধুয়ে-মুছে, শুকিয়ে প্রত্যেকটি সংযোজন করলেই পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে। অবশ্য একই রাত্রে দ্বিতীয়বার জেলী প্রয়োগের সময় যন্ত্রটি পরিষ্কার না করেও ব্যবহার করা যায়।

ট্যাবলেট

ট্যাবলেটগুলি কাঁচের টিউবে থাকে, কখনবা রাংতা কাগজে জড়ানো থাকে। ছিপি খুললেই কিংবা রাংতা কাগজ ছিঁড়লেই গোল কিংবা চ্যাপ্টা ধরনের সাদা বড়ি বেরিয়ে পড়বে। দেখতে ছোট হলেও বেশ শক্ত, তাই শুধু হাতেই প্রয়োগ করা যায়। বড়িটি তাপসহ, একারণে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। বড়িটি বুদবুদ-ধর্মী, তাই জলীয় আবহাওয়া কিংবা পদার্থের সান্নিধ্যে ফেনিয়ে ওঠে। একারণে ট্যাবলেটের টিউবটির ছিপি ভাল করে এঁটে শুকনো

জায়গায় রেখে দিতে হবে। অবশ্য যদি প্রতিটি বড়ি রাংতা কাগজে জড়ানো থাকে, এই সতর্কতার প্রয়োজন নেই।

সাধারণত, কোন শুক্রকীটনাশক দ্রব্য, সোডিয়াম বাই-কার্বনেট এবং যে কোন ঘনীভূত এ্যাসিড, যেমন টার্টারিক কিংবা বোরিক এ্যাসিডের সমন্বয়ে এই ট্যাবলেটটির সৃষ্টি। যতক্ষণ শুকনো থাকে বড়িটি অবিকৃত থাকে আর স্ত্রীঅঙ্গের আদ্রর্তার কিংবা বীর্যস্থিত জলীয় পদার্থের সংস্পর্শে এলেই, জলের সঙ্গে বড়িটির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরী হয়। এটাই সৃষ্টি করে প্রচুর ফেনা। এই ফেনিল পরিবেশ শুক্রকীটধ্বংসী এবং জরায়ুমুখের সামনে অকৃত্রিম আবরণী সৃষ্টি করে।

ট্যাবলেটের স্থান জেলীর মত উচ্চ না হলেও আমাদের দেশে সাপোজিটারীর অভাবে এবং জেলীর নিষিদ্ধক্ষেত্রে এর মূল্য অনেক। আর যদি ঠিকমত গলে যায় এবং সময়মত মিলিত হওয়া যায় এর নির্ভরযোগ্যতাও মন্দ নয়।
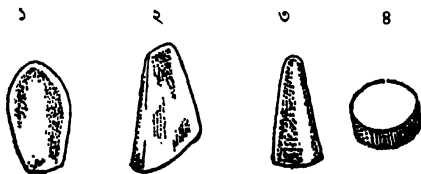
৪৬নং ছবি—ট্যাবলেট ও সাপোজিটারী

১, ২, ৩। বিভিন্ন আকৃতির সাপোজিটারী ৪। ট্যাবলেট

এদের প্রয়োগবিধি জলের মত সহজ। মিলনের পূর্বে একটি বড়ি পরিষ্কৃত হাতের দু' আঙ্গুল দিয়ে ধরে স্ত্রীঅঙ্গের অভ্যন্তরে, যতটা সম্ভব, প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। জেলী প্রয়োগের সময় যে আসনভঙ্গী ও প্রয়োগোত্তর নিশ্চলতার উল্লেখ করেছি তা এখানেও

প্রযোজ্য। স্ত্রীঅঙ্গে রসক্ষরণের অভাব হলে, ট্যাবলেটটি এক সেকেণ্ডের মত জলে ভিজিয়ে নিতে হবে।

জলে ভেজান ট্যাবলেট প্রয়োগের পর পাঁচ মিনিটের বেশী এবং জলে না ভিজিয়ে প্রয়োগ করলে দশ মিনিটের (বড় জোর ১৫ মিনিট) বেশী অপেক্ষা করা অনুচিত। যতবারই মিলিত হবেন
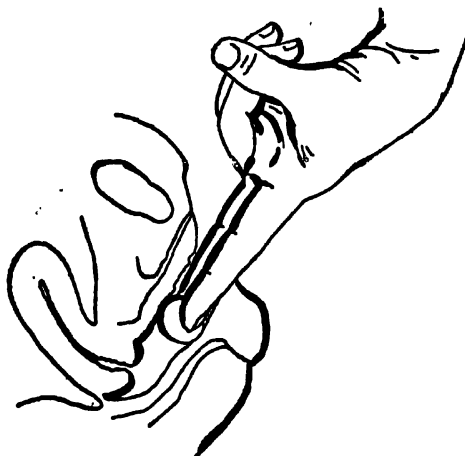
৪৭নং ছবি—ট্যাবলেট প্রয়োগ

ততবারই একটি করে নতুন বড়ি ব্যবহার করতে হবে। মিলনের পর কোন ধোয়া-মোছার প্রয়োজন নেই। যা কিছু সবই শেষ মিলনের ছ' থেকে আট ঘণ্টা পরে। ডুশেরও কোন প্রয়োজন নেই।

সাপোজিটারী

সাপোজিটারী কিংবা দ্রবণীয় পেসারী দেখতে ছোটখাটো বাদামের মত। দেখতে শুধু যে ছোট তা নয়, শক্তও বটে। তাই, খালি হাতে

প্রয়োগ করা যায়। সাধারণত কোকো বাটার এবং কোন শুক্রকীট-ধ্বংসী দ্রব্যাদির সমন্বয়ে এটা তৈরী। দিনতাপে গলে যেতে পারে বলেই রাংতা কাগজে জড়ানো থাকে। এটি কিন্তু দেহতাপের সান্নিধ্যে গলে যায়। দেহতাপের বেশী যেখানে দিনতাপ, সেখানে এমনি অবস্থাতেই গলে না যাওয়াটাই অস্বাভাবিক। একারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রথম শ্রেণীর সাপোজিটারীর কথা ভাবাই যায় না। দু'একটি যে না পাওয়া যায় তা নয়, পাওয়া গেলেও এই একই কারণে নির্ভরযোগ্য নয়। মিলনের দশ মিনিট পূর্বে সাপোজিটারী প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োগ বিধি হুবহু ট্যাবলেটের মত।

ডুশ

কি ও কেন ?—পিচকারীর সাহায্যে জল দিয়ে স্ত্রীঅঙ্গ পরিষ্কার করাই হল ডুশ নেওয়া। আমাদের দেশে ডুশ কথাটি প্রায়ই অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখি, অনেকেই ডুশ দিয়ে মলত্যাগের কথা বলেন। এটা হবে এনিমা। ডুশ দিয়ে পরিষ্কার করা হয় স্ত্রীঅঙ্গ আর এনিমা দিয়ে মলনালী। মিলনের অব্যবহিত পরেই পরিষ্কার জল (শুধু জলও শুক্রকীটনাশক) কিংবা শুক্রকীটধ্বংসী দ্রব্যাদি মিশ্রিত জলের সাহায্যে শুক্রকীটের নিধন এবং স্ত্রীঅঙ্গ থেকে বহিষ্করণ সম্ভবপর হয় বলেই ডুশ দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়, বিশেষ করে অভাবের সময়, বিপদের সময়।

ডুশের যন্ত্রপাতি—দু' রকমের, ঝর্না ডুশ আর বাল্‌ব ডুশ :

● ঝর্না ডুশ—এটা দিয়ে ডুশ ও এনিমা, দু'কাজই সারা যায়। শুধু মুখের নলটা পাল্টে নিলেই হল। এই যন্ত্রটির একটি পাত্র আছে, এতে জল ভর্তি করা হয়। পাত্রটি সাধারণত কোন ধাতুর তৈরী। রবারেরও হতে পারে। প্রয়োজন হলে গরম জলের ব্যাগ দিয়েও এই

পাত্রের কাজ চালান যেতে পারে। পাত্রটির তল থেকে একটা লম্বা রবারের নল নেমে এসেছে আর এই নলের শেষ প্রান্তে আছে আর

১। জলাধার
২। রবারের নল
৩। চাবিকাঠি
৪। এনিমার নল
৫। ডুশের নল

৪৮নং ছবি—ঝর্না ডুশ
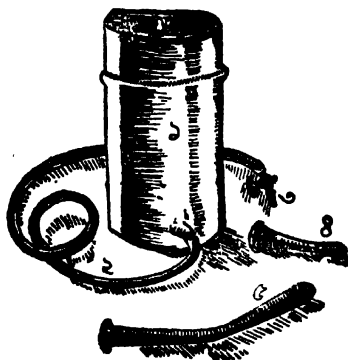
একটি যন্ত্র। এর চাবি খুলে দিলেই জল বেরুতে থাকবে। এরই সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হয় ডুশের কিংবা এনিমার নল।

● বালব্ ডুশ—ঝর্না ডুশের মত অত বড় পাত্র আর অত বড় নল এর নেই। আছে গোল একটা বালব্, এটাই হল পাত্র, এর মধ্যে আধ পাঁইট (এক পোয়া) জল ধরে। এই পাত্রের মুখে লাগানো থাকে একটা মোটা ডুশের নল। একটা ছোট্ট ঢাকনি দিয়ে নলের মুখটি বন্ধ থাকে। আর থাকে একটা ডুশবর্ম বা বড় ঢাকনি। এটা ঐ নলের গায়ে লাগানো থাকে, এটা দিয়ে যোনিমুখ বন্ধ করে দিতে হয়। এই যন্ত্রটি শুধু ডুশের জন্যেই অর্থাৎ এটা দিয়ে এনিমা দেওয়া যায় না বা উচিত নয়।

ডুশের জল—দু পাঁইট জল (৪০ আউন্স) কিংবা চায়ের বড় কাপের ছ' কাপ জল চাই। পানীয় জল একটু গরম (হাত দিয়ে

সহ্য করা যায়) করে নিলেই জলটা ডুশের উপযোগী হয়ে উঠবে।

৪৯নং ছবি—বালব্ ডুশ
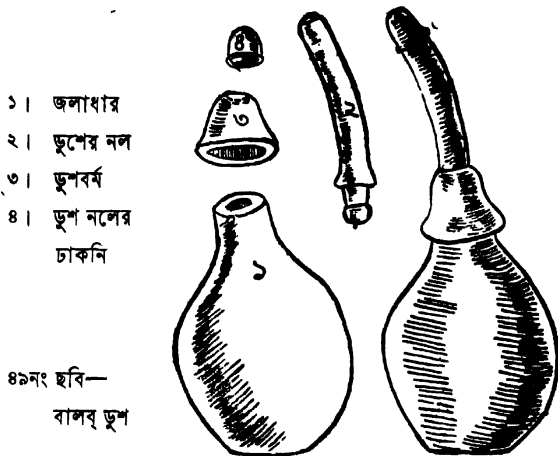
এখন এই জলের সঙ্গে নিম্নলিখিত যে কোন একটি মিশিয়ে নিতে হবে :

(১) খাদ্যলবণ—ষাট চা-চামচ

(২) ভাল সাবান—চার চা-চামচ লাক্সের গুঁড়ো অথবা ½ ইঞ্চি থেকে ¾ ইঞ্চি কিউব পরিমিত গায়ে মাখা সাবান

(৩) ভিনিগার—আট থেকে ষোল চা-চামচ

(৪) ল্যাকটিক এ্যাসিড—এক থেকে দুই চা-চামচ

(৫) পাতিলেবুর রস—চার থেকে আট চা-চামচ

(৬) ফটকিরী চূর্ণ—এক চা-চামচ

উপরোক্ত তালিকায় শুক্রকীটঘ্ন দ্রব্যাদি নির্ভরযোগ্যতার ক্রমানুসারে সাজান হয়েছে অর্থাৎ এদের মধ্যে খাদ্যলবণই সবচেয়ে

ভাল। ফটকিরী কখনও নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। আর ডুশের জলে কোন অসুবিধা হলে (যেমন, জ্বালা করলে) হয় জল মিশিয়ে পাতলা করে নিতে হবে, না হয় পরের বারে একটু কম করে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগ বিধি—ডুশের জন্যে বালব্ ডুশ ও ইউনিভার্সাল বেড প্যানের প্রয়োজন বড্ড বেশী। প্রথমে বালব্ ডুশটি জলে
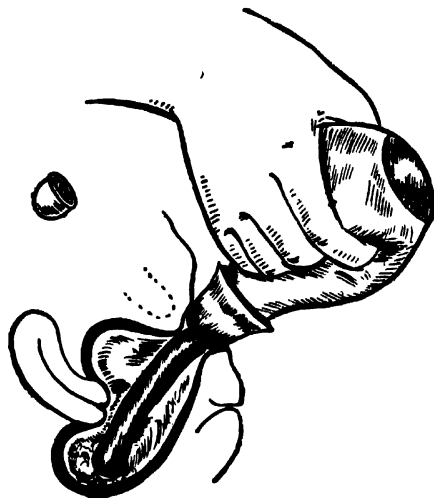
৫০নং ছবি—বালব্ ডুশ প্রয়োগ

ভর্তি করে ডুশনলের মুখটি ছোট ঢাকনি দিয়ে এঁটে হাতের কাছে রেখে দিতে হবে। বীর্যস্খলনের অব্যবহিত পরেই ডুশের নলটি উন্মুক্ত করে, শায়িত অবস্থায়, স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে আর ডুশ-

বর্মটি সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে এসে যোনিমুখে আটকে দিতে হবে। এখন দু' আঙ্গুল দিয়ে বালবৃটি আস্তে আস্তে টিপতে থাকুন। এরই ফাঁকে স্বামীর সহায়তায় বেড প্যানটি নিম্নাঙ্গে স্থাপন করতে হবে। দু' আঙ্গুল দিয়ে টিপতে টিপতে প্রায় সমস্তটা জল স্ত্রীঅঙ্গে চলে যাবে এবং এই জলের চাপে যোনিপথ প্রসারিত হয়ে পড়বে। এখন এই জলটাকে কয়েক সেকেণ্ডের মত ভিতরে ধরে রাখতে হবে ; তারপর বর্মটি খুলে দিলেই ভিতরের জল বেরিয়ে আসবে। এতক্ষণ পর্যন্ত বালবৃটি কিন্তু টিপেই ধরে থাকতে হবে। ডুশ-কাঠি স্ত্রীঅঙ্গ থেকে বের এনে হাতের চাপ ঢিলে করতে পারেন। এখন আবার বালবৃটি জলে ভর্তি করতে হবে। এই ভাবে ৩।৪ বালব্ ভর্তি জল দিয়ে স্ত্রীঅঙ্গ ধুয়ে ফেলতে হবে।

ঝর্না ডুশও এভাবে শুয়ে শুয়ে নেওয়া যেতে পারে। শায়িত অবস্থায় নিতম্ব থেকে দু' ফুট উঁচুতে পাত্রটি ঝুলিয়ে রেখে দিতে হবে। মিলনশেষে ডুশের নলটি স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিয়ে চাবি খুলে দিতে হবে। জল প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে যোনিমুখ (হাত দিয়ে চেপে ধরে কিংবা মাংসপেশীর সঙ্কোচনে) সঙ্কুচিত করতে হবে। জলটা ভিতরে কিছুক্ষণের জন্যে ধরে ছেড়ে দিতে হবে। এই ভাবে পাত্রস্থিত সমস্ত জলটা দিয়ে স্ত্রীঅঙ্গ ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫১নং ছবি—ঝর্না ডুশ প্রয়োগ

ডুশ প্রয়োগের ঝামেলা কষ্টকর না হলে, রতিতৃপ্তিতে উভয়ের কোন কিছু ঘাটতি দেখা না দিলে ডুশ নেওয়া যেতে পারে। ডুশের অনুরক্ত হলে দু'টি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :

এক, যথাশীঘ্র ডুশ নেওয়া। কিছুতেই বীর্যস্খলনের পর দু'মিনিটের বেশী দেরী করা চলবে না।

দুই, ডুশের জল স্ত্রীঅঙ্গ প্রসারিত করে সমস্ত ভাঁজ সমান করে ফেলবে। শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি বালব্ ডুশে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় বলেই জন্মরোধের জন্যে আমরা এই ডুশের পক্ষপাতী।

পদ্ধতিটির প্রথম ত্রুটি হল, রস-ভঙ্গ। দ্বিতীয় ত্রুটি হল, এতে সাফল্যলাভ বেশ অনিশ্চিত (১৬% – ৭০%)। একারণেই নিয়মিতভাবে ডুশ প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য নয়।

পদ্ধতি চাই, ঘরেই আছে।

একটু তুলো, এক টুকরো কাগজ, কি একফালি কাপড় ত' প্রত্যেকেরই ঘরে থাকে। স্পঞ্জ প্রতি ঘরে ঘরে না থাকলেও, কারুর কারুর যে না থাকে তা নয়। দরকারের সময় এরাই আপনার গোপন বন্ধু হতে পারে। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু (যেমন নুন, চালের গুঁড়ো) কিংবা ঘরের এদিকে ওদিকে ছড়ান ব্যবহার্য দ্রব্যও (সাবান, ফটকিরী) জন্মরোধের সঙ্গী হতে পারে। এই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলি মোটামুটি চার রকমের: ট্যাম্পন, স্পঞ্জ, রাসায়নিক এবং তৈলাক্ত দ্রব্যসমূহ।

স্পঞ্জ, ট্যাম্পন প্রভৃতি ঘরোয়া পদ্ধতিগুলি কিছুটা কম নির্ভরযোগ্য হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এদের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিগুলি কোন কারণে অপ্রযোজ্য বা নিষিদ্ধ হলেই এদের ডাক পড়ে। ভ্রমণের সময়ে, বিদেশে, পরগৃহে কিংবা স্বগৃহে মালমসলার অভাবে, এরাই এগিয়ে আসে আপনার সাহায্যের জন্যে। আর সুদূর পল্লীতে, ডাক্তার-ক্লিনিকের অভাবে এবং দারিদ্র্যদোষে এদের প্রয়োজনীয়তা অনেক। ঘরে ঘরেই পাওয়া যায় আর খরচাও এমন কিছু নেই, তাই প্রয়োজন হলে যে কেউ এর আশ্রয় নিতে পারে। নির্ভরযোগ্যতার বিচারে স্পঞ্জই শ্রেষ্ঠ, তারপর ট্যাম্পন। একারণে ঘরোয়া পদ্ধতি অনুরাগীদের প্রথমেই চেষ্টা করতে হবে স্পঞ্জের জন্যে। স্পঞ্জের অভাবে ট্যাম্পন। ট্যাম্পনও না থাকলে, অন্য কিছু (রাসায়নিক এবং তৈলাক্ত দ্রব্যসমূহ)।

স্পঞ্জ

আমাদের দেশে ততটা জনপ্রিয় না হলেও বিদেশে নিরুপায় ও দরিদ্র দম্পতিদের মধ্যে স্পঞ্জ অতীব জনপ্রিয়। আমেরিকায় ফোম (ফেনপ্রস্থ) পাউডারের সঙ্গে স্পঞ্জের চলন বড্ড বেশী। ব্রিটিশ গোষ্ঠী-দের মধ্যে শুধু মারী ষ্টোপসই অলিভ অয়েলের সঙ্গে স্পঞ্জের নির্দেশ দিয়েছেন। ইদানীং এশিয়া মহাদেশেও লবণগোলা জলের সঙ্গে স্পঞ্জ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ডাঃ ক্ল্যারেন্স. জে. গ্যাম্বল এর অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এই স্পঞ্জ চার রকমের : সাধারণ রবারের স্পঞ্জ, ফোম রবারের স্পঞ্জ, প্লাষ্টিক স্পঞ্জ ও সামুদ্রিক স্পঞ্জ। প্রথম তিনটি স্পঞ্জ নির্ভয়ে জলে ফুটিয়ে পরিষ্কার করা যায়, টেকেও অনেক দিন, দামেও বেশ সস্তা, আর স্পঞ্জের ফুটোগুলোও বেশ ছোট। সামুদ্রিক স্পঞ্জের ক্ষেত্রে কিন্তু এর সবই উল্টো। রবারের স্পঞ্জ আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক রকমের হতে পারে। কোনটি ছোট, কোনটি বেশ বড়। কোনটি
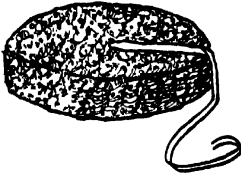
৫২নং ছবি—রবারের স্পঞ্জ

৫৩নং ছবি—সামুদ্রিক স্পঞ্জ

স্কোয়্যার অর্থাৎ লম্বায় চওড়ায় সমান, কোনটিবা একেবারেই গোল। কোন কোনটির মধ্যখানে একটা ছোটখাটো গহ্বরের মত থাকে। এদের নাম অক্লুসেটর স্পঞ্জ, এই গর্ত্তটির মধ্যে কোন ট্যাবলেট রেখে জরায়ু-

মুখে পরিয়ে দিতে হয়। আবার স্পঞ্জ কেটে সার্ভাই ক্যাল্ ক্যাপ্‌ও তৈরী করা যায়। রবারের সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপের মত নির্ভরযোগ্য নয় বলেই শেষোক্ত স্পঞ্জ দু'টির কোনটাই সমর্থনযোগ্য নয়।

স্পঞ্জকে সহভেষজ আবরণীর অন্যতম নিদর্শন বলা যেতে পারে। নিম্নলিখিত ভেষজ (রাসায়নিক) দ্রব্যের যে কোন একটি স্পঞ্জে মাখিয়ে বা ভিজিয়ে প্রয়োগ করা যায় :

● ফোম পাউডার—ডুপোনল, ষ্টার্চ ও প্যারাফর্ম্যাল্ডিহাইড দিয়েই ফোম পাউডার তৈরী হয়। এটা আমেরিকার অবদান এবং সেখানেই চলে বেশী।

● জলীয় দ্রব্য—ডুশের জল তৈরী করতে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের উল্লেখ করেছি (৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তার সব কটাই স্পঞ্জের (ও ট্যাম্পনের) সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে ডুশের মত অতটা একসঙ্গে তৈরী করার প্রয়োজন নেই। একটু কম পরিমাণে রাসায়নিক সংমিশ্রণ তৈরী করে একটা ছিপি দেওয়া শিশিতে রেখে দেবেন। এদের মধ্যে ১০%-২০% লবণগোলা জলই (প্রতি দশ চা-চামচ জলে এক-দুই চা-চামচ খাদ্য-লবণ) সবচেয়ে ভাল।

● তৈলাক্ত দ্রব্য—যে কোন বিশুদ্ধ গ্রহণযোগ্য তৈল এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। সরিষার তৈল বাদ দিয়ে যে কোন তৈল, যেমন অলিভ (জলপাই), নারিকেল, তিল, বাদাম, তিসি, রেড়ী বা নিম প্রয়োগ করা যায়। ইচ্ছা হলে এদের সঙ্গে (নিম তৈল বাদে) কোন শুক্রকীটনাশক দ্রবণ-চূর্ণ, যেমন কুইনিন, ফটকিরী, মিশিয়ে নিতে পারেন। এদের মধ্যে নিম তৈলই (অভাবে অলিভ তৈল) সবচেয়ে ভাল।

নিম তৈল প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমেই কিছু নিম ফল (জ্যৈষ্ঠ মাসে পাওয়া যায়) সংগ্রহ করুন। তারপর খোসা ছাড়িয়ে নিমফলের

বিচিগুলি বের করে নিন। এই বিচিগুলি রোদে ৩।৪ দিন শুকিয়ে নিয়ে ঢেঁকিতে অথবা হামান দিস্তায় কুটতে হবে এবং জলে একদিনের মত ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর বিচি-চূর্ণ সমেত এই জল উনুনে ফোটাতে হবে যতক্ষণ না নিম তৈল ভেসে ওঠে। এখন মাখন তোলার মত এটি তুলে নিতে হবে এবং কোন পাত্রে গালিয়ে নিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলেই খাঁটি মিম তৈল তৈরী হয়ে যাবে।

● দ্রবণ-চূর্ণ—কুইনিন, সোহাগার গুঁড়ো, ফটকিরীর গুঁড়ো, সাবানের গুঁড়ো—যে কোন একটি জলে ভেজা স্পঞ্জে (বা ট্যাম্পনে) সরাসরি প্রয়োগ করা যায়।

● জেলী-ক্রীম—কোন জেলী বা ক্রীম মাখিয়ে প্রয়োগ করলে ত' খুবই ভাল। ট্যাবলেটও মন্দ নয়। ইচ্ছা হলে, ডাক্তারখানা থেকে কুইনিন (৩%—১০%), বোরিক এ্যাসিড (৫%), ল্যাকটিক এ্যাসিড (২%—৩%) প্রভৃতি যে কোন একটির মলম তৈরী করে নিয়ে কাজে লাগাতে পারেন। আর যদি বিনা খরচায় কাজ সারতে চান, গার্হস্থ্য জেলী তৈরী করে নিন।

● গার্হস্থ্য জেলী—ডাঃ ক্লারেন্স. জে. গ্যাম্বল কর্তৃক উদ্ভাবিত, ১৪% চালের গুঁড়ো ও ১০% লবণ মিশ্রিত এই জেলী নির্ভরযোগ্যতায় যে কোনও প্রথম শ্রেণীর জেলী ও ট্যাবলেটের সমতুল্য। এই জেলী শুধুই কিংবা স্পঞ্জ (ট্যাম্পন) সহযোগে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার আপৎ-কালে দু' চা-চামচের মত স্ত্রীঅঙ্গে প্রয়োগ করাও যায়। গার্হস্থ্য জেলী তৈরীর নিয়ম : কিছু চাল ভিজিয়ে রোদে শুকিয়ে নিন, তারপর গুঁড়ো করে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিন। এবারে আট চা-চামচ এই চালের গুঁড়ো নিন, এর মধ্যে পনরো চা-চামচ নুন দিন। এখন আস্তে আস্তে জল দিন আর নাড়তে থাকুন। ২।৩ মিনিটের মধ্যে সমস্তটা মাখামাখা হয়ে গেলে বাকী জলটা ঢেলে দিন। সবসুদ্ধ মোট জল লাগবে ১০

আউন্স (এক পোয়া)। এবারে উনুনে চাপিয়ে ফোটাতে থাকুন, মধ্যে মধ্যে নেড়ে দেবেন, ২০।৩০ মিনিটের মধ্যে ফুটতে ফুটতে ক্বাথে পরিণত হবে। এই জেলী একসঙ্গে ৫।৭ দিনের প্রয়োজন মত তৈরী করবেন।

স্পঞ্জ সংগ্রহ—প্লাষ্টিক কিংবা ফোম রবারের স্পঞ্জ যদি পাওয়া যায়, এদের যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারেন। অভাবে সাধারণ রবারের স্পঞ্জ। সামুদ্রিক স্পঞ্জ না কেনাই উচিত।

দোকানের তৈরী করা স্পঞ্জ মাপে ছোট এবং দামেও বেশ চড়া, তাই এ জাতীয় স্পঞ্জ না কেনাই ভাল। দোকান থেকে একটি গোটা বাথ স্পঞ্জ কিনে আনুন, এ থেকেই, দুই কিংবা তিন ইঞ্চি স্কোয়্যার ও চওড়ায় ½ ইঞ্চি, এই মাপ মত কেটে তৈরী করে নিতে হবে। কাটবার সময় স্পঞ্জটা জলে ভিজিয়ে নেবেন। আবার আপনার হাতের তালুর মাপে গোল করে কেটে নিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের মাপমত চওড়াটা ঠিক করে নিলেই একটি সুন্দর জন্মরোধক স্পঞ্জ তৈরী হয়ে যাবে। এরই মাঝখানে একটা চার ছ' ইঞ্চি লম্বা সুতোও বেঁধে নিতে পারেন।

প্রয়োগ বিধি—প্রথমেই একটি (কি দু'টি) স্পঞ্জ জলে পাঁচ মিনিটের মত ফুটিয়ে নিন, আর সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে ফেলুন। তারপর লবণগোলা জল কিংবা নিম তৈল অথবা মনোমত যে কোন ভেষজ দ্রব্যে ভিজিয়ে বা মাখিয়ে নিয়ে মিলনের অব্যবহিত পূর্বে কিংবা কিছুক্ষণ (এই এক আধ ঘণ্টার মত) পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। স্পঞ্জটি দু'ভাঁজে (কিংবা চার ভাঁজে) মুড়ে নিয়ে শায়িত অবস্থায় স্ত্রীঅঙ্গে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়ে দিন। স্ত্রীঅঙ্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলে, এর ভাঁজ ছড়িয়ে দিতে হবে, টিপে টিপে জরায়ুগ্রীবার চারপাশে বসিয়ে দিতে হবে। শেষ মিলনের ছ' ঘণ্টা পরে ও বার ঘণ্টার আগে স্পঞ্জটি বের করে আনতে হবে। সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপের মত আঙ্গুল

দিয়ে বের করে আনা যায়। এতে অসুবিধা হলে, স্পঞ্জে লাগানো সুতো ধরে টান দিলেই এটা বেরিয়ে আসবে। দ্বিতীয় মিলনে, দ্বিতীয় স্পঞ্জ প্রয়োগ। প্রথম মিলনের প্রথম স্পঞ্জটি ভিতরে থাকলে, দ্বিতীয় স্পঞ্জটি এর উপরেই প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবহৃত স্পঞ্জটি দু'চার মিনিট জলে ফুটিয়ে নিতে পারেন কিংবা সাবান গোলা গরম জলে ধুয়ে নিতে পারেন। তারপর ঠাণ্ডা জায়গায় শুকিয়ে রেখে দেবেন। এইভাবে যত্ন নিলে একটি স্পঞ্জ তিন চার মাস যায়।

স্পঞ্জ সাফল্য মন্দ নয়। মোটামুটিভাবে এটা যে সাফল্যপ্রদ (৭০% —৯০%) তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, স্পঞ্জ যে শুধু সমর্থন করি তা নয়, স্পঞ্জ যে স্বল্পব্যয়ে অন্যতম নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি তাও সানন্দে ঘোষণা করি।

ট্যাম্পন

স্ত্রীঅঙ্গে কোন কিছু নরম দ্রব্য প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার অর্থ হল ট্যাম্পনের আশ্রয় নেওয়া। জন্মরোধক ট্যাম্পনের উদ্দেশ্য হল যথা-সম্ভব জরায়ুমুখ ঢেকে রাখা। আবার স্ত্রীঅঙ্গে তরল শুক্রকীটনাশক দ্রব্যাদি (কিংবা ঔষধাদি) প্রয়োগের সহজতম উপায়ও এই ট্যাম্পন। স্পঞ্জের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অর্থাৎ স্পঞ্জ ও ট্যাম্পনের কার্যকারিতার জন্যে এদের আবরণীমূলক ধর্ম অপেক্ষা রাসায়নিক প্রভাবই বেশী দায়ী।

নানান রকমের জিনিস দিয়ে ট্যাম্পন তৈরী করা যায়। পাতলা নরম কাগজ (যেমন টয়লেট পেপার, অয়েল পেপার), পাউডারের পাফ, ছোট রুমাল কিংবা লিণ্ট জাতীয় কাপড় দিয়ে ট্যাম্পন তৈরী করা যায়। সাধারণত, সুতী বা সিল্কের কাপড়, তুলো, পশম, রেশম প্রভৃতি যে কোনটি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমন কি

ছেলেদের খেলার জন্যে যে ছোট রবারের বল পাওয়া যায় তা পিন দিয়ে ফুটিয়ে চুপসে নিয়েও কাজে লাগান যায়। আর অর্ধকর্তিত পাতিলেবুর শাঁসটুকু ফেলে দিলেই ছোট স্বদেশী সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ তৈরী হয়ে যাবে।

নিয়মিতভাবে প্রয়োগের জন্যে উপরোক্ত ট্যাম্পনগুলির মধ্যে তুলোর থোপনাই সবচেয়ে ভাল ; তুলোর অভাবে সুতী বা সিল্কের কাপড়, পশম বা রেশম দিয়ে তৈরী ট্যাম্পনও মন্দ নয়। অন্যান্যগুলি হাতের পাঁচ হয়ে থাকুক, প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই ব্যবহার করবেন।
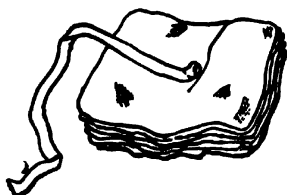
৫৪নং ছবি—কাপড়ের ট্যাম্পন

এখন ট্যাম্পন কি করে তৈরী করতে হয় তারই আলোচনা। প্রথমেই কিছু পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ড, পশম, রেশম বা সাধারণ তুলো (ডাক্তারী তুলো নয়, তোশক বালিশের তুলো) জোগাড় করতে হবে। বিশ ত্রিশটা থোপনা হাঁসের ডিমের-মাপমত অথবা আপনার হাতের তালুর মাপে গোল করে আর বুড়ো আঙুলের মাপমত চওড়া করে একসঙ্গে তৈরী করে রেখে দিন। কাপড়ের হলে এত চওড়ার প্রয়োজন নেই ; ঐরূপ
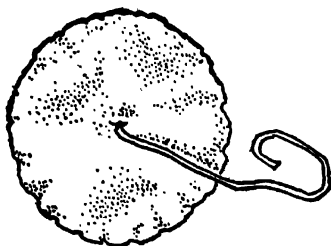
৫৫নং ছবি—তুলোর ট্যাম্পন

গোল করে কাটা চার ছ'টি কাপড় একসঙ্গে সেলাই করে নিতে হবে। এরই মাপে বোনা, সুতোর জালে জড়িয়ে নিতে পারেন কিংবা গোটা-কতক সূচের ফোঁড় দিয়ে সেলাই করে নিতে পারেন। জালটা থেকে যাবে বটে, কিন্তু খোপনাটা একবারের বেশী টেকে না। অবশ্য কাপড়ের ট্যাম্পন অনেকদিন চলে। এরই মাঝখানে একটা চার ছ' ইঞ্চি লম্বা সুতোও বেঁধে নিতে পারেন। এখন লবণ গোলা জল কিংবা নিম তৈল অথবা স্পঞ্জ অধ্যায়ে ১০৫ ও ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ভেষজ দ্রব্যগুলির মধ্যে মনোনীত যে কোন একটির সঙ্গে ট্যাম্পন প্রয়োগ করুন। প্রয়োগ বিধি হুবহু স্পঞ্জের মত।

ভারতেরই কোন এক ক্লিনিকে গার্হস্থ্য জেলী সহযোগে তুলো ও কাপড়ের ট্যাম্পনের সাফল্য হল ৭৪%। এই ট্যাম্পনের সঙ্গে কোন স্বাভাবিক পদ্ধতি (যেমন তিথি-সহবাস, খণ্ডিত সুরত, আসনভঙ্গী) যুক্ত হলে, সাফল্যলাভ নিঃসন্দেহে আরও বেশী হবে।

ট্যাম্পনে সাফল্যলাভ কম হলেও একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কোথায় এবং কেন এদের প্রয়োগ, তা যদি একটু ভাবি এই সাফল্যটুকুও যে অনেক তা হয়ত আপনি নিজেই স্বীকার করবেন।

কিছুই নেই, বলছি শোন!

অভাবের সময় এগিয়ে আসে এবং বিপদে রক্ষা করে বলেই এদের নাম আপৎকালীন পদ্ধতি। এই আপতিক পদ্ধতি আবার দু'রকমের। একটি আপৎকালে অবলম্বনীয় "বিপদ-ধর্ম"। অপরটি পন্থাভাবে প্রযোজ্য "অভাব-কর্ম"। প্রথমটি বিপদ ঘটে গেছে (যেমন কন্‌ডম্ ফেটে গেছে, সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ জরায়ুচ্যুত হয়ে গেছে, খণ্ডিত স্মরতে কিংবা বহির্যোনি সঙ্গমে কিছু বীর্য স্ত্রীঅঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয়েছে) এ অবস্থার প্রতিষেধক বিশেষ। দ্বিতীয়টিতে বিপদ ঘটেনি, তবে মিলিত হলেই ঘটবে অথচ হাতের কাছে কিছুই নেই, এমন ক্ষেত্রে অগতির গতি হিসেবে প্রযোজ্য।

অভাবে—অভাবের সময় স্বাভাবিক ও গার্হস্থ্য পদ্ধতির যে কোন একটি বেছে নিতে হবে: স্বাভাবিক পদ্ধতির মধ্যে বহির্যোনি সঙ্গমই ভাল। খণ্ডিত স্মরতও মন্দ নয়।

না হয়, স্পঞ্জ, তুলোর কিংবা কাপড়ের ট্যাম্পন।

তাও যদি না মেলে, যে কোন জিনিস (যেমন, ছোট রুমাল, পাউডার পাফ্, লেবুর খোসা, চুপসানো বল ইত্যাদি) দিয়ে ট্যাম্পন তৈরী করে নিতে পারেন। হাতের কাছে নিম তৈল, লবণ গোলা জল কিংবা অলিভ অয়েল, থাকে ত' ভালই, এর সঙ্গে ট্যাম্পন প্রয়োগ করুন। অভাবে যে কোন তৈল জাতীয় দ্রব্য (ভেসলীন বা গ্রীজ; লাইমজুস গ্লিসারিন প্রভৃতি হেয়ার ক্রীম; সরিষার তৈল বাদে যে কোন তৈল), যে কোন স্নেহপ্রধান দ্রব্য (ঘি, মাখন, ডালডা),

যে কোন ফলের অম্ল রস (ডালিমের রস, তেঁতুলের জল, লেবুর রস, পিঁয়াজের রস), যে কোন রসায়ন-চূর্ণ (সাবান, খাদ্যলবণ, ফটকিরি, সোহাগা ও কুইনাইন), এমন কি মধুও ব্যবহৃত হতে পারে।

সময় বিশেষে, কোন রকমের ট্যাম্পনও হয়ত না পেতে পারেন, তখন উপরোক্ত ভেষজ দ্রব্যের, বিশেষত তৈল জাতীয় দ্রব্যাদির, যে কোন একটি স্ত্রীঅঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে।

এমন কি রবারের লম্বা বেলুনও কনডমের অভাব মেটাতে পারে।

বিপদে—স্ত্রীঅঙ্গে নিক্ষিপ্ত বীর্যস্থিত শুক্রকীটের জরায়ুতে চলে যেতে সময় লাগে দু'মিনিট। তাই, যেমন করেই হোক এর আগেই সব কিছু সেরে ফেলতে হবে।

জন্মরোধক দুর্ঘটনা ঘটামাত্রই, সোজা দাঁড়িয়ে উঠে দু'চারবার কাশবেন কিংবা কোঁত দেবেন। তারপর হাঁটু গেড়ে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে জোরে ক'বার কোঁত দিতে হবে। এরই ফাঁকে ফাঁকে দু' আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে যোনিগাত্র (সামনে ও পিছনে) চেঁচে চেঁচে পরিষ্কার করতে হবে।

এরপর হয় শুধু পরিষ্কার জলের ডুশ, না হয় কোন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ।

ডুশের অভাবে গাড়ু বা বদনার ভোঁতা মুখটি স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিয়ে পাত্রস্থিত জল দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করা যায়। এতে অনেকেরই হয়ত মন উঠবে না। এঁদের জন্যে রইল ধৌতকরণ কিংবা ফেনায়িতকরণ, যেটা খুশি।

ডুশের যন্ত্রপাতির অভাবে ধৌতকরণ অর্থাৎ শুধু জল দিয়েই স্ত্রীঅঙ্গ পরিষ্কার করা যায় : কিছুটা তুলো বা বস্ত্রখণ্ড শুধু জলে (কিংবা সাবান গোলা জলে) ভিজিয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসা অবস্থায়, দু'আঙ্গুল দিয়ে ধরে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিন। প্রথমেই

জরায়ুমুখে, পরে তার চারপাশে প্রক্ষালন। তারপর দু' আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত স্ত্রীঅঙ্গের মার্জনা। অঙ্গমার্জনার সময় তুলো বা বস্ত্র-খণ্ডটি মাঝে মাঝে জলে ভিজিয়ে নিতে হবে।

এতদনুরূপ ধৌতকরণের চেয়ে ফেনায়িতকরণ আরও ভাল : হাঁটু-গেড়ে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসা অবস্থায় যে কোন ভাল গায়ে মাখা সাবানের টুকরো (কিছুটা সাবানের গুঁড়ো কিংবা কিছুটা শেভিং ক্রীম) স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দু'আঙুলের সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্ত্রীঅঙ্গের সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ফেন-সঞ্চার করতে হবে। তুলো বা বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যেও এটা সম্ভব। তারপর অঙ্গমার্জনার সাহায্যে যোনিপথের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সফেন প্রক্ষালন। সবশেষে সাদা জল দিয়ে স্ত্রীঅঙ্গের পরিষ্করণ।

ডুশের পরিবর্তে যে কোন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করতে পারেন :

এই উদ্দেশ্যে যে কোন জেলী কিংবা গার্হস্থ্য জেলী ব্যবহৃত হতে পারে। নিক্ষেপক-যন্ত্র দিয়ে, স্পঞ্জ বা ট্যাম্পন দিয়ে, আঙুল দিয়ে, চা-চামচ দিয়ে কিংবা সরাসরি টিউবটা স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিয়ে কিছুটা জেলী প্রয়োগ ; তারপর অঙ্গ-মার্জনার সাহায্যে সমস্ত স্ত্রীঅঙ্গে জেলী-সঞ্চার করতে হবে।

জেলীর অভাবে যে কোন রাসায়নিক দ্রব্য, যে কোন তৈলাক্ত কিংবা স্নেহপ্রধান দ্রব্য অথবা যে কোন ফলের অম্লরস প্রভৃতি হাতের কাছে যা পাবেন তাই তুলো বা বস্ত্রখণ্ডে ভিজিয়ে কিংবা শুধুই দ্বিধাহীন চিত্তে প্রয়োগ করবেন, অঙ্গ মার্জনা করবেন।

এমনি করেই বিপদের মুখোমুখি হলে বিপদ যে পাশ কেটে চলে যাবে তা অনেকটা নিশ্চিত।

দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি

এ যাবৎ আলোচিত সাময়িক পদ্ধতিগুলি প্রতিটি মিলনে প্রয়োগের জন্যে। এতে অনেকেরই অভিযোগ। এরা চায় কোন কিছু খেয়ে বা ইঞ্জেকশন নিয়ে বেশ কিছুকাল রতিরভসে কাটিয়ে দেবে। এজাতীয় স্বপ্নের কিছু কিছু বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এরাই হল দীর্ঘমেয়াদী জন্মরোধক পদ্ধতি। এটা বলতে আমরা বুঝি :

১। দীর্ঘমেয়াদী সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ (প্লাষ্টিক ও পোর্শিয়ো ক্যাপ্)।

২। যান্ত্রিক পদ্ধতি (জরায়ুমুখের ও জরায়ুমধ্যের পেসারী।

৩। শৈত্য বা তাপ প্রয়োগ।

৪। এক্স-রে প্রয়োগ।

৫। ঔষধাদি (হর্মোন, ইঞ্জেকশন, স্পার্মাটক্সিন)।

৬। প্লাষ্টিক অপারেশন।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির প্রধানতম সুবিধা এই যে, প্রতিটি মিলনে জন্মনিয়ন্ত্রণের তথাকথিত হাঙ্গামা নেই অথচ গর্ভ-নিরাপত্তা আছে। তবে বিপদ আপদ আছে অনেক। সবচেয়ে বড় বিপদ হল, ভবিষ্যতে হয়ত প্রজননক্ষমতা ফিরে নাও আসতে পারে। অর্থাৎ চোখ-কান বুজে বেছে নেওয়ার মত পদ্ধতি এটা নয়। আপাতত একারণে এজাতীয় কোনটিরই সমর্থন করতে পারলাম না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্লাষ্টিক ক্যাপ্ এবং সুনির্বাচিত ক্ষেত্রে জরায়ুমধ্যের পেসারী ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই।

দীর্ঘমেয়াদী সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্—কোন শক্ত পদার্থ দিয়ে তৈরী সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ জরায়ুগ্রীবায় একাদিক্রমে মাসাধিককাল রেখে দেওয়া যায়। এদের মধ্যে প্লাষ্টিক ক্যাপ্ই সবচেয়ে ভাল এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে এটা দিয়ে একমাসের মত গর্ভ-নিরাপত্তা পাওয়া যায়। এর ব্যবহারবিধি অনেকটা রবারের সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপের মতই।

যান্ত্রিক পদ্ধতি—যান্ত্রিক জন্মরোধকদ্রব্যাদি প্রধানত দু'রকমের: জরায়ুমুখের আর জরায়ুমধ্যের পেসারী। প্রথমটি থাকে জরায়ু-
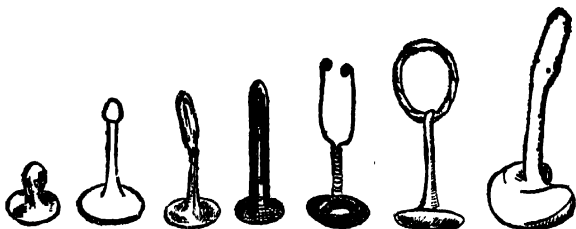
৫৬। ষ্টাড ৫৭। কলার বাটন • ৫৮। ষ্টেরিলেট
৫৯। ষ্টেম ৬০। গোল্ডপিন ৬১। পুষ্ট পেসারী
৬২। ফ্রাক্টুলেট

৫৬-৬২নং ছবি—বিভিন্ন ধরনের জরায়ুমুখের পেসারী

মুখে, দ্বিতীয়টি জরায়ু-গহ্বরে; কয়েক মাস থেকে এক আধ বছর জরায়ুতেই রেখে দেওয়া যায়। জরায়ুমুখের পেসারীতে মারাত্মক কুফল দেখা দেয় বলেই এটি কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

জরায়ুমুখের পেসারী দেখতে অনেকটা জামার ষ্টাড বোতামের মত, প্রজাপতির মতও হতে পারে। রুপো, সোনা, ইস্পাত, হাতীর দাঁত প্রভৃতি শক্ত জিনিস দিয়ে এটা তৈরী। জরায়ুর মধ্যে লেগে

থাকার মত একটা ডাঁটি বা নল আছে আর জরায়ুমুখ ঢেকে দেওয়ার জন্যে একটা গোল চাকতিও থাকে। ডাঁটির গা বেয়ে বেয়ে কিংবা চাকতির ফুটো দিয়ে মাসিক স্রাবের রক্ত বেরিয়ে আসে। এই বিশেষ ধরনের বোতাম জরায়ুমুখে এঁটে দেওয়া হয় বলেই গর্ভ বন্ধ থাকে।

জরায়ুমধ্যের পেসারী জড়ানো রেশম গুটিসুতা কিংবা রুপোর তার দিয়ে জড়ানো রিং হতে পারে। এই রিংটাই হল গ্রাফেনবার্গ
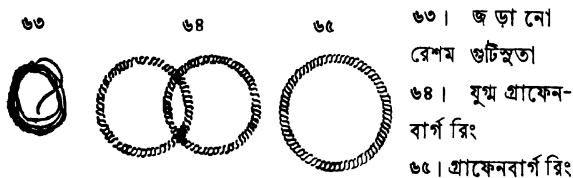
৬৩-৬৫নং ছবি—জরায়ুমধ্যের বিভিন্ন পেসারী

রিং। জরায়ুমুখ সামান্য একটু প্রসারিত করে এই রিংটা যন্ত্রযোগে জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এটা এক বছর পর্যন্ত ভিতরে রেখে দেওয়া হয়। এবং এই রিংয়ের জন্যেই গর্ভ হয় না।

শৈত্য বা তাপ প্রয়োগ—পন্থাটি শুধু পুরুষদের জন্যেই। শুক্রাশয়ে তাপ বা শৈত্য প্রয়োগে শুক্রকীটের জন্মদান কিছুকাল স্থগিত থাকে বলেই সাময়িক বন্ধ্যাকরণ সম্ভবপর। জাপানে খুব গরম জলে স্নান করার রেওয়াজ আছে। এটা যে জন্মরোধক, এ বিশ্বাস তাদের আছে। অণ্ডকোষে নানাবিধ আবরণী (ল্যাঙ্গট, সাসপেন্সারী ব্যাণ্ডেজ) ব্যবহারেও স্থানীয় তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। হয়ত এই কারণে অনেক খেলোয়াড়ের প্রজনন ক্ষমতা কম। প্রাণীজগতে তাপ বা শৈত্য প্রয়োগে সাময়িক বন্ধ্যাকরণ যে সুনিশ্চিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনুষ্যজগতে এতখানি নিশ্চিন্ততা এখনও আসেনি। যতদিন না

উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারিত হবে, কার্যকারিতার সঠিক মেয়াদ জানা যাবে, ক্ষতিশূন্যতার সুনিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া যাবে ততদিন আপনাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

এক্স-রে প্রয়োগ—পুরুষের যৌনাঞ্চলে এবং নারীর তলপেটে রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ করেও গর্ভরোধ করা যায়। রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় কিছু কালের জন্যে শুক্রকীট বা ডিম্বাণু তৈরী হতে পারে না বলেই এটা সম্ভব। পদ্ধতিটির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল সঠিক মাত্রা নির্ধারণ। একটু বেশী হলেই প্রজনন ক্ষমতা চিরতরে লোপ পাবে, এমন কি প্রৌঢ়বয়সে ঋতুবন্ধজাত যে কষ্টকর উপসর্গ দেখা দেয় তাও হাজির হতে পারে ; একটু কম হলে কোন কাজই হবে না। এবং যদিই বা কার্যকরী হয় অনুর্বরকালের মেয়াদ (শুরু ও শেষ) কতদিন তা সহজেই জানা যায় না। আর ব্যয়বহুল ত' বটেই।

পদ্ধতিটি তেমন নিরাপদ নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়, ক্ষতির আশঙ্কাও যথেষ্ট। তাই, সমর্থনযোগ্য নয়।

ঔষধ—ঔষধের সাহায্যে গর্ভ-নিয়ন্ত্রণের প্রথম প্রচেষ্টা হল স্পার্মাটক্সিন, বীর্যটিকা। এটা অনেকটা কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের টিকা নেওয়ার মত। টিকা নিলে যেমন এই রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তেমনি বীর্যটিকায় অর্থাৎ শুক্রকীটের ইঞ্জেকশনে স্ত্রী-দেহে গর্ভাধানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি সৃষ্ট হয়। এটা যতদিন কার্যকরী থাকবে ততদিন কোন গর্ভাধান দেখা দেবে না। কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে কার্যকরী হলেও মনুষ্যজগতে এটা এখনও পরীক্ষামূলক। আপাতত ইঞ্জেকশন নিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

ঔষধ যোগে জন্মরোধের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল হর্মোন, এষ্ট্রোজেন, প্রজেষ্টেরন, এ্যাণ্ড্রোজেন। এদের যে কোন একটি খেয়ে কিংবা ইঞ্জেকশন নিয়ে গর্ভ-সম্ভাবনা যে দূর করা যায় তাতে কোন সন্দেহ

নেই। কিন্তু মাসের পর মাস হর্মোন ব্যবহারে খরচ অনেক আর নানাবিধ কুফল বা ব্যাধি দেখা দিতে পারে। একারণে জন্মরোধক হিসেবে হর্মোন প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়।

তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে যত্রতত্র বিজ্ঞাপিত ও বাজারের প্রচলিত ঔষধগুলি পুরোদস্তুর অবৈজ্ঞানিক এবং আদৌ কেনার যোগ্য নয়। অর্থাৎ সর্বথা পরিত্যাজ্য।

প্লাষ্টিক অপারেশন—দীর্ঘমেয়াদী গর্ভরোধের আরেকটি উপায় হল অপারেশন। পুরুষ ও নারী যে কেউ এর আশ্রয় নিতে পারে। প্রথমে এমন একটি অপারেশন করা হয় যার ফলে সন্তানের জন্মদান স্থগিত থাকে। এই অপারেশনের মূলসূত্র অনেকটা বন্ধ্যকরণ অপারেশনের মত। ২।৪ বছর পরে দম্পতিরা সন্তানেচ্ছু হলে আরেকটি অপারেশন করে প্রজনন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা হয়। দেখতে সোজা হলেও ফলাফল বেশ অনিশ্চিত অর্থাৎ অপারেশন (প্রথম) করা সত্ত্বেও গর্ভ হতে পারে এবং দ্বিতীয় অপারেশনের পর প্রজনন ক্ষমতা ফিরে নাও আসতে পারে। একারণে, এজাতীয় অপারেশন কোন-মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। অপারেশন যদি করাতেই হয়, প্রজনন ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েই আসরে নামতে হবে। এটাই হল বন্ধ্যকরণ।

বন্ধ্যাকরণ প্রসঙ্গে

কি ?—যৌন আনন্দ পুরোপুরি বজায় রেখে সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নামই হল বন্ধ্যাকরণ বা ষ্টেরিলাই-জেশন। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে শুধু বন্ধ্যা বা ষ্টেরাইল করে দেওয়া হয়।

কেন ?—সাধারণত, এই পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ শতকরা শতটি ক্ষেত্রেই অব্যর্থ। একারণে গর্ভবতী হলে প্রসূতির প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে এমন ক্ষেত্রে (হৃৎপিণ্ডের ও কিডনীর মারাত্মক ব্যাধি, বহুমূত্র প্রভৃতি) এ জাতীয় পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। সামাজিক ও যৌন অপরাধীদের কোথাও (পূর্বে জার্মানীতে এবং বর্তমানে আমেরিকার কতিপয় রাষ্ট্রে) জোর করে ষ্টেরিলাইজড করে দেওয়া হয়। সৌজাত্যবিদ্যার খাতিরেও (মানসিক ব্যাধি, অপরাধ-প্রবণতা ও বংশানুক্রমিক রোগ সন্তানসন্ততির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাই) বন্ধ্যাকরণের চলন আছে। আর আছে সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্যে। এবং এরই চলন কিন্তু আজকাল বেশী। মনোমত সন্তান-সন্ততি (৩।৪টি) লাভের পর, আজকাল অনেকেই বন্ধ্যাকরণ করিয়ে নিচ্ছেন।

বন্ধ্যাকরণের পদ্ধতি—চিরতরে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে সবচেয়ে ভাল পদ্ধতিটি হল অপারেশন। অপারেশন একান্তই অসম্ভব হলে, যেমন বৃদ্ধা কিংবা বয়স্কা রুগ্না নারীর ক্ষেত্রে, তলপেটে এক্স-রে বা জরায়ু অভ্যন্তরে রেডিয়ম্ প্রয়োগে বন্ধ্যাকরণ করা হয়। এই অপারেশন পুরুষেরও হয় আর নারীর ত' হয়ই।

পুরুষের অপারেশনে দুদিকের অণ্ডকোষে (অণ্ডে নয়) সামান্য একটু কেটে শুক্রাণুনালী দুটি টেনে বার করা হয়। এখন এর সামান্য একটু অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় আর দুই প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হয়। এর ফলে যে বীর্য বেরিয়ে আসবে তাতে আর সবই থাকবে, থাকবে না শুধু শুক্রকীট। শুক্রকীট থাকে না বলেই ষ্টেরিলাইজড পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষের অপারেশন খুব সুবিধার: ছোট্ট আধ ঘণ্টার অপারেশন, অজ্ঞান হতে হয় না, পেটও কাটতে হয় না, স্ত্রীর মত ৮।১০ দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয় না, এমন কি অপারেশন শেষে হেঁটে হেঁটে বাড়ী যাওয়া সম্ভব। কোন কষ্ট হয় না, ইনজেকশন
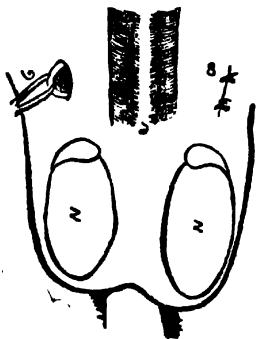
১। পুরুষাঙ্গ
২। শুক্রাশয় বা অণ্ড
৩। শুক্রাণুনালী টেনে বার করা হয়েছে
৪। অণ্ডকোষের ক্ষত সেলাই করে দেওয়া হয়েছে

৬৬নং ছবি—পুরুষের বন্ধ্যাকরণ অপারেশন

দিয়ে জায়গাটা অসাড় করে নেওয়ার সময় একটু যা পিঁপড়ের কামড়ের মত যন্ত্রণা, তারপর ১।২ দিন একটু অস্বস্তিবোধ। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এতে খরচ অনেক কম (১০০৲—১৫০৲) আর চুপিসারে একাজ সেরে নেওয়া যায়। বাড়ীর কাকপক্ষীও টের পাবে না, শনিবারে অপারেশন করিয়ে সোমবারে অফিসে যাওয়া যায়। অপারেশনের পরও

যথারীতি বীর্যপাত ঘটবে, তবে পরিমাণে এক চতুর্থাংশের মত কম। প্রথম দিককার বীর্যপাতে কিছু শুক্রকীট থাকতে পারে এবং এথেকে গর্ভ হতে পারে। একারণে প্রথম ছ'টি স্খলনে জেলী সহযোগে কন্‌ডম্ কিংবা অন্য কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি অবশ্য ব্যবহার্য। তারপর বীর্য পরীক্ষা করে গর্ভ-নিরাপত্তা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

স্ত্রীর অপারেশন একটু বড়। প্রসবের পর, মাসিকের অব্যবহিত পরেই কিংবা অন্য কোন অপারেশনের সময় স্ত্রীর এই

১। প্রসারণী দিয়ে উদরাভ্যন্তর উন্মুক্ত রাখা হয়েছে
২। ডিম্বাণুনালী টেনে বার করা হয়েছে এবং বেঁধে দেওয়া হচ্ছে
৩। জরায়ু
৪। অপর ডিম্বাণুনালীটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে
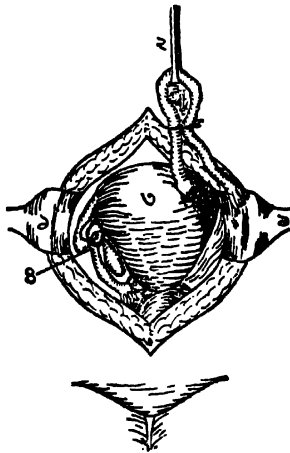
৬৭নং ছবি—নারীর বন্ধ্যকরণ অপারেশন

অপারেশন করা হয়। প্রথমেই অজ্ঞান করে, হয় উপর থেকে পেট কাটতে হবে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটাই করা হয়) না হয় নীচের থেকে যোনিপথের শেষ প্রান্ত ফুটো করে পেটের মধ্যে ঢুকতে হবে।

তারপর ডিম্বাণুনালী দুটির অংশ বিশেষ কেটে বেঁধে দেওয়া হয়, কখনবা, অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে, এই বেঁধে দেওয়া অংশ দুটি সন্নিহিত অঞ্চলে প্রোথিত করা হয়। ফলে, ভিতর থেকে কোন ডিম্বাণু এবং বাইরে থেকে কোন শুক্রকীট ডিম্বাণুনালীতে আসতে পারে না। এমনি করেই গর্ভ চিরকালের জন্যে স্থগিত রেখে দেওয়া হয়। পুরুষের অপারেশনের মত কোন সুখ সুবিধাই নারীর অপারেশনে নেই। এতে কষ্টও হয় অনেক বেশী আর কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়। এই অপারেশনে খরচও অনেক (৩৫০৲—৫০০৲) এবং এটাই এর সবচেয়ে বড় বাধা। অপারেশনের পর পুরুষের মত কয়েকদিন জন্মরোধক দ্রব্যাদি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রজনন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার কি সম্ভব ?—এই অপারেশন একবার করিয়ে নিলে প্রজনন ক্ষমতা বড় একটা ফিরিয়ে আনা যায় না। বড় একটা বললাম এই জন্যে যে কখন কখন (৫%—২০%) প্লাষ্টিক অপারেশনের সাহায্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব. অর্থাৎ ফলাফল সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। এই হেতু ঐচ্ছিক বন্ধ্যাকরণ অপারেশনের সময় প্রজনন ক্ষমতা যে ফিরে পাওয়া যাবে না, তা মনে রেখেই আসরে নামা ভাল।

স্বামী না স্ত্রী ?—অপারেশন কে করাবে তা স্থির করার ভার ডাক্তারের উপর ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত। তবে স্ত্রী যেখানে দুর্বল, অর্থ সমস্যা যেখানে প্রকট, সেখানে স্বামীরই উচিত এগিয়ে আসা। তাছাড়া স্বামীর অপারেশনের পক্ষে আরও অনেক যুক্তি আছে, যেমন গোপনীয়তা, ছোট অপারেশন, বিপদের ঝুঁকি নেই, অপারেশনের পর দু'একদিনের মধ্যেই সর্বতোভাবে কার্যক্ষম হওয়া যায়।

স্বামী স্ত্রীর যে কেউ, যে কোন বয়স্ক (১৮ বছরের বেশী বয়স) ও সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি এই অপারেশন করাতে পারেন। আইনে ঢালাও

অনুমতি থাকলেও, তিন চারটি সন্তানের পিতা মাতা না হয়ে এই অপারেশন করান অনুচিত। কেননা একবার এই অপারেশন করিয়ে নিলে ভবিষ্যতে মাথা খুঁড়লেও আর ছেলেপিলে হবে না।

বন্ধ্যাকরণ কি ক্ষতিকর?—এ প্রশ্ন দেখি শুধু পুরুষেরই। নারীর ক্ষেত্রে এঁরা নির্বিকার। যদি পুরুষের মত অল্প খরচায় নারীর অপারেশন সম্ভব হত, এ প্রশ্ন কোনদিনই উঠত না। যা কিছু এক্সপেরিমেণ্ট সবই স্ত্রীর উপর চলুক, এই এঁদের মনোভাব। তাই নারীর ক্ষেত্রে, বড় একটা ক্ষতির প্রশ্ন উঠতে দেখি না। যাহোক পুরুষের অপারেশনে কোন ক্ষতি নেই। এটা যে শুধু আমার প্রায় দু'শ অপারেশনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি তা নয়, হ্যাভলক এলিস, ডিকিনসন্ প্রমুখ পৃথিবীর সমস্ত যৌন পণ্ডিতই এই একই কথা বলেন। তাছাড়া, ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, অ্যামেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, লণ্ডনস্থ ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন, প্ল্যানড পেরেণ্টহুড ফেডারেশন অব অ্যামেরিকা প্রভৃতি প্রত্যেক সংস্থাই এই অপারেশনের ক্ষতিহীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এমন কি ভারত সরকারও।

অপারেশনের ফলে কারুরই (না স্বামীর, না স্ত্রীর) কোন ক্ষতি হয় না। অপারেশনের আগে যা ছিল, অপারেশনের পরেও ঠিক তাই থাকবে, শুধু ছেলেপিলে হবে না, এই যা। দেহ, মন ও যৌনতা সবই অটুট থাকে। উভয়ের কার্যক্ষমতা, দৈহিক স্বাস্থ্য, মনের সুস্থতা এবং নারীর মাসিকস্রাব সবই অক্ষুণ্ণ থাকবে। নর ও নারীর যৌনতার কোন ক্ষেত্রেই ঘাটতি পড়ে না। অঙ্গের দৃঢ়তা বা উত্থানের কোন গোলযোগ ঘটে না, স্থায়িত্বকাল ও ক্ষমতা ঠিকই থাকে। সোজা কথায়, যৌন উত্তেজনাই বলুন আর যৌন তৃপ্তিই বলুন সবই আগেকার মত থাকে। এমন কি রতিশেষে বীর্যস্খলনও।

জন্মনিয়ন্ত্রণে প্রগতির ধারা

প্রগতির পদক্ষেপ সর্বত্রই দেখি। জন্মনিয়ন্ত্রণেও এর ছাপ পড়েছে। সারা পৃথিবীতে সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ পন্থার জন্যে সন্ধান চলেছে। এই গবেষণালব্ধ দু'টি সর্বাধুনিক ফলাফল হল :

- শুধু জেলী সহযোগে জন্মনিয়ন্ত্রণ।
- শুধু ঔষধের সাহায্যে জন্মরোধের প্রচেষ্টা।

একক জেলী প্রয়োগে জন্মরোধের সফল প্রচেষ্টা 'রাসায়নিক পদ্ধতি' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু শুধু জেলীতেও কেউ কেউ তৃপ্ত নয় আর প্রতিমাসে ৩।৪ টাকার মত জেলী খরচ অনেকেরই কাছে রতিবিলাস। এঁদের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা সেবনীয় ঔষধের নির্দেশ দিয়েছেন। ইদানীং জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধু ঔষধ সেবনেই সম্ভব। পৃথিবীতে এটাই হল সর্বাধুনিক প্রগতি।

বিগত বিশ বছর ধরে সারা পৃথিবীতে সেবনীয় ঔষধ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে এবং এজাতীয় ঔষধের মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

এক, ডাঃ সান্যালের বড়ি। আমাদের দেশেরই একজন বাঙ্গালী ডাঃ এস. এন. সান্যাল এই বড়িটি আবিষ্কার করেছেন। এঁর মতে শুধু একটি কি দু'টি বড়ি খেয়ে এক মাসের মত গর্ভমুক্তি পাওয়া যায়।

দুই, ১৯-নর-ষ্টেরয়েড গোষ্ঠীর যৌগিক পদার্থগুলি সাম্প্রতিক-কালের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার। জন্মরোধক হিসেবে এদের পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্যে আমেরিকার ডাঃ গ্রেগরী পিনকাস, ডাঃ জন রক ও তাঁদের সহকর্মীর অবদানই মূলত দায়ী। প্রতিটি মাসিক

চক্রের ৫ থেকে ২৫ দিন, এই একুশ দিন ধরে প্রত্যহ একটি কি দুটি বড়ি খেতে হয়। ৮৩ জন নারীকে আড়াই বছর ধরে এই বড়ি ('এনাভিড') খাইয়ে উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ শতকরা ৯৮'৯টি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্যের উল্লেখ করেছেন (১৯৫৮)। তারপর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই, বিশেষ করে আমেরিকায়, গ্রেট ব্রিটেনে, জাপানে ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে, এনিয়ে কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। এযাবৎ সহস্রাধিক নারীকে এই বড়ি খাওয়ান হয়েছে এবং গড়ে ৯৬-৯৯% সাফল্যলাভ দেখা গেছে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছে এবং কোথাও কোন মারাত্মক রকমের কুফল ঘটেনি। কিন্তু বড়িটির গোটাকতক ত্রুটি আছে : একটু ব্যয়-বহুল এবং কিছু কিছু উপসর্গ (যেমন, বমি বমি ভাব, মাথা ধরা, মাসিক স্রাবের গোলযোগ) দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি খুব সামান্য এবং কিছুকাল পরেই এগুলি চলে যায়। আর শতকরা ১৫ জন নারী এবংবিধ উপসর্গের জন্যে বড়ি খাওয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাহলেও এটুকু বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, ১৯-নর-ষ্টেরয়ডস আশাতীতভাবে সাফল্যপ্রদ ও দু বছর একাদিক্রমে খাওয়া যায় এবং এতে কোন কুফলের ভয় নেই। বর্তমানে এজাতীয় ঔষধ ভারতে পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রতিটি বড়ির দাম দশ আনার মত। তাহলেও আশা করা যায় ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এর দাম কমবে।

ঔষধের সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল সুরটি হল ডিম্বাণু নিয়ন্ত্রণ। ইদানীং শুক্রকীট নিয়ন্ত্রণেরও চেষ্টা চলছে। ঔষধ সহযোগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রথম সূত্রপাত : গর্ভাধানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তির সৃষ্টি। এটা স্পার্মাটক্সিন। এ সম্বন্ধে ১১৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় পন্থা : ডিম্বাণু যাতে আদৌ সৃষ্ট না হয় তার চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ ডিম্বস্ফোটন স্থগিত রাখা হয়। হর্মোন প্রয়োগে এটা সম্ভব। ১১৭ ও ১১৮ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে কিছু বলেছি। আপাতত এ জাতীয়

ক্ষতিশূন্য পদ্ধতির জন্যে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে এবং ১৯-নর-ষ্টেরয়ডস এই গবেষণারই একটি সুফল।

তৃতীয় পন্থা : ডিম্বস্ফোটন হলেও ডিম্বাণুকে দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়, ফলে শুক্রকীট ঐ ডিম্বাণু নিষিক্ত করতে পারে না। হেসপিরিডিন্ ফসফেট্ প্রয়োগে প্রাণীজগতে এটা সম্ভব। আমেরিকায় ডাঃ সিভী মনুষ্যজগতেও এর সাফল্যের উল্লেখ করেছেন। এটা এখনও পরীক্ষাধীন।

ডিম্বাণু নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ পন্থা : নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুগাত্রে প্রোথিতকরণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। ডা: সান্যালের বড়িটি এই ভাবেই কাজ চালিয়ে নেয়।

প্রথমে ডাঃ সান্যাল মটর ডাল থেকে একরকম জন্মরোধক তৈল নিষ্কাশিত করেন। পরে এই পদার্থটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করেন। এর নাম 'মেটাজাইলোহাইড্রোকুইনোন।' এই ঔষধটি যে সর্বতোভাবে ক্ষতিশূন্য তাও পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে কতকগুলি স্ত্রী-ইঁদুরকে খাওয়ানো হয় এবং প্রায় প্রত্যেকটির গর্ভনিরোধ সম্ভবপর হয়। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডাঃ সান্যাল মনুষ্যসমাজে এর কার্যকারিতা লক্ষ্য করেন : গর্ভাধানের হার ৫০%—৬০% কমে যেতে দেখেছেন। ৭২৭ জন নারী ২৫ মাস যাবৎ নিয়মিত-ভাবে বড়ি খেয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে কেউই কোন উপসর্গের অভিযোগ করেননি। আর এই সময়ের মধ্যে অর্ধেকেরও কম নারীর গর্ভ হয়েছিল।

বড়িটি প্রতি মাসে খেতে হয়। ডিম্বস্ফোটনের অব্যবহিত পরেই একটি বড়ি, এর সাতদিন পরে আরেকটি বড়ি খাওয়াই নিয়ম। যাঁদের স্রাব নিয়মিত এবং ত্রিশ দিনের মধ্যে হয়, তাঁদেরকে স্রাবের পর ষোল দিনের দিন একটি এবং ২৩ দিনের দিন আরেকটি বড়ি খেলেই চলবে আর যেদিন স্রাব হওয়ার কথা সেদিন না হলে তার

পরের দিনে আরও দুটি বড়ি খেতে হবে। আরও অনিয়মিত হলে তিনটি বড়ি, ১৬, ২৩ ও ৩০ দিনের দিন, প্রত্যেক দিন একটি করে। যাঁদের স্রাব কোন নিয়মকানুনের ধার ধারে না, তাঁদের জন্যে প্রতি সপ্তাহে একটি করে বড়ি।

অনেকেরই ধারণা, এই বড়ি দিয়ে গর্ভ নষ্ট করা যায়। এটা ভুল। আর সন্তান প্রসবের পর ৬ মাস পর্যন্ত এই বড়ি খাওয়া অন্যায়। স্তনদুগ্ধ নষ্ট হয়ে যাবে, তাই।

এই বড়ি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। আপনারা যদি কেউ এটা পেতে চান সোজা দর্জিপাড়াস্থিত নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের বলদেওদাস মেটার্নিটি হাসপাতালের বিপরীত দিকে সরকারী ক্লিনিকে চলে যান। এঁরা ঔষধ বিক্রি করেন না, বিনা মূল্যে দান করেন। তবে প্রতি মাসে স্ত্রীকে সঙ্গে করে এখানে আসতে হবে।

ভারত সরকারের পরিচালনায় অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের নেতৃত্বে ডাঃ সান্যালের ঔষধ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই পরীক্ষায় শতকরা ৬০টি ক্ষেত্রে ঔষধটি যে কার্যকরী তা প্রমাণিত হয়েছে। এঁদের আশা ঔষধটি নামমাত্র মূল্যে বাজারে ছাড়বেন। এই সুদিনের আর দেরী নেই।

বর্ত্তমানে পুরুষদের জন্যেও ব্যবহারযোগ্য বড়ি পাওয়া যাচ্ছে। এই বড়িটি ডাঃ সান্যালের সর্বাধুনিক আবিষ্কার। দুটি বড়ি পনর দিন অন্তর খেতে হয়। ৬৬ জন পুরুষ ১৪ মাস যাবৎ এই বড়ি খেয়েছেন। এবং এই সময়ের মধ্যে মাত্র ১২ জন পিতা হয়েছেন।

ভবিষ্যতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যদি এই বড়ি খান, সাফল্য-হার যে আরও বেশী বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া, এই বড়ি স্বল্পমূল্য ও ক্ষতিহীন। তাই ডাঃ সান্যালের ঔষধ ভবিষ্যতের আশা ভরসা।

পরিশিষ্ট (১)

জন্মরোধক পদ্ধতি নির্বাচন

ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিটি প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। অর্থাৎ এ যাবৎ আলোচিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে হবে। কিন্তু কোনটি? এর জবাবে বলব :

মনের মত পুত্রকন্যা পেয়েছেন আর সন্তানাদি চান না, আপনাদের সন্তানসন্ততি আদর্শসংখ্যার (তিন চারটি) কাছাকাছি অথবা সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছটি কিংবা ছটির বেশী, এমন ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী জন্মরোধক পদ্ধতি বা বন্ধ্যাকরণ অপারেশনই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু যাঁদের অত ছেলেপিলে হয়নি, তাঁদের? এঁদের জন্যে আছে সাময়িক জন্মরোধক পদ্ধতিগুলি। এজাতীয় নির্ভরযোগ্য স্ত্রীপন্থাগুলির মধ্যে ডায়াফ্রাম্, ডুমাস, ভিমিউল ও সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন এদের মধ্যে কোনটি ও কত সাইজের ক্যাপ্ আপনার জন্যে লাগবে তা জানার জন্যে এবং কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শেখার জন্যে আপনাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারের কাছে আসতেই হবে। আপনাদের গ্রামের নিকটবর্তী হেলথ সেণ্টারে খোঁজ করতে পারেন কিংবা কোলকাতায় কোন হাসপাতালে (যেমন, ইডেন, ডাফরিন্) অথবা কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক বা সংস্থায় আসতে পারেন। অন্যথায় এই স্ত্রী-পন্থাগুলি অচল।

ডাক্তারের কাছে স্ত্রীর আসাটা একান্তই অসম্ভব হলে পুরুষের ক্যাপ্ বা কন্‌ডমের আশ্রয় নিতে হবে।

কন্‌ডম্‌ ব্যবহারে অসহায়হীনভাবে অক্ষম হলে শুধু জেলী ব্যবহার করতে হবে। জেলীতেও অসুবিধার সম্মুখীন হলে কোন ক্রীম বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিথি-সহবাস কিংবা খণ্ডিত সুরতের সঙ্গে যুক্তভাবে জেলী বা ট্যাবলেট ব্যবহার করা যায়।

আর প্রয়োগসাপেক্ষ পদ্ধতিমাত্রেই গাত্রদাহ দেখা দিলে কোন স্বাভাবিক পদ্ধতি (যেমন, তিথি-সহবাস, খণ্ডিত সুরত) বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় কি !

পরিশিষ্ট (২)

জন্মনিয়ন্ত্রণের সারকথা

● জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে জন্মরোধক পদ্ধতিগুলির ক্রমপর্যায় হল : খণ্ডিত সুরত, কন্‌ডম্‌, জেলী/ক্রীম, ফোম ট্যাবলেট, সার্ভাই-ক্যাল্‌ ক্যাপ্‌, ডায়াফ্রাম্‌, ডুশ, স্পঞ্জ, তিথি-সহবাস, ব্রহ্মচর্য ও বন্ধ্যাকরণ অপারেশন।

কিন্তু নিজের পছন্দমত পদ্ধতি বেছে নিয়ে, যে কোন দোকান থেকে মালমসলা কিনে এনে, নিজের খুশিমত প্রয়োগ করলে ব্যর্থ যে হবেন সে ত' জানা কথাই। কেননা, জন্মনিয়ন্ত্রণে সাফল্যের জন্যে চাই :

এক, সুনির্বাচিত পদ্ধতি।

দুই, নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

তিন, পদ্ধতিটির সুষ্ঠু ও নিয়মিত প্রয়োগ।

● স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ও প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে পদ্ধতির রূপ বদল হয়। একারণে কোন ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার বা ফ্যামিলি

প্ল্যানিং ক্লিনিক অথবা কোন জন্মনিয়ন্ত্রণবিদ্ ডাক্তারের পরামর্শ বাঞ্ছনীয়। এটা একান্তই অসম্ভব হলে পরিশিষ্ট (১) অধ্যায়ের নির্দেশ-মত যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিতে হবে।

● ভাল নাম করা ডাক্তারী দোকানে কিংবা কোন বিশ্বস্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে সব সময়েই জন্মরোধক দ্রব্যাদির সওদা করবেন। তা হলেই খাঁটি, টাটকা ও নির্ভরযোগ্য জিনিস পাবেন।

● মনে রাখবেন অধিকাংশ ব্যর্থতা অনিয়মিত প্রয়োগ, ভুলমতে প্রয়োগ কিংবা নিজের সুবিধামত একটু আধটু উল্টে পাল্টে নিয়ে প্রয়োগ করার জন্যেই ঘটে। প্রয়োগকালে যতই বেশী সতর্ক হবেন, যতই নিয়মমাফিক চলবেন, আপনার সাফল্যলাভ ততই বেশী সুদৃঢ় হবে।

● শতকরা শতটি ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ শুধু বন্ধ্যাকরণ অপারেশনেই সম্ভব। দ্বৈত পদ্ধতিতেও [যেমন যে কোন নির্ভরযোগ্য আবরণী (কন্‌ডম্ ; ডায়াফ্রাম্ ; ডুমাস, ভিমিউল ও সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্) আর নিক্ষেপক-যন্ত্রযোগে জেলী] এমনতরো সাফল্যলাভ (৯৯.৯%) আছে। একারণে অপরিহার্য জন্মরোধের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি দুটির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে হবে। আর জন্মনিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়, এমন ক্ষেত্রে এত কষ্ট করে যুগ্ম বা ত্রি-পন্থার আশ্রয় না নিলেও চলে। যে কোন নির্ভরযোগ্য আবরণী জেলী মাখিয়ে প্রয়োগ করা যায় কিংবা কোন রাসায়নিক বা অন্য কোন একক পদ্ধতি।

● স্বাভাবিক মিলনের মত ষোল আনা তৃপ্তি জন্মনিয়ন্ত্রণ-আশ্রিত মিলনে কখনই সম্ভব নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে যৌনানন্দের ভাগে একটু কম পড়বেই, একটু কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। হয় পুরুষকে, না হয় নারীকে, কিংবা উভয়কেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যতই চরম গর্ভ-নিরাপত্তার দিকে ঝুঁকবেন, মিলনের তৃপ্তি ও স্বাভাবিকতার সুর

ততই কমে আসবে। একটা উদাহরণ দিই: শুধু জেলীতে তৃপ্তি আছে প্রচুর কিন্তু (১০—১৫%) বিপদের ঝুঁকি আছে। অন্যদিকে দ্বৈত পন্থায় শুধু জেলীর মত তৃপ্তি ও স্বাভাবিকতা যে নেই তা ঠিকই, কিন্তু চরম সাফল্যলাভ আছে।

● বিজ্ঞানসম্মত জন্মরোধক পদ্ধতি প্রয়োগে কোন ক্ষতি হয় না।

● আমাদের দেশে ঔষধ সেবনে কিংবা ইঞ্জেকশনে কয়েক মাস বা কয়েক বছর যাবৎ ক্ষতিশূন্য, নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদী জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। অতএব ঔষধ বা ইঞ্জেকশনের সাহায্যে গর্ভরোধের চটকদার বিজ্ঞাপনে কখনও ভুলবেন না।

● বর্তমানে ঔষধ সেবনে সাময়িক জন্মরোধের প্রচেষ্টা সবচেয়ে বিস্ময়কর। এটাই হল জন্মনিয়ন্ত্রণে প্রগতি। দুঃখের বিষয়, এ জাতীয় ঔষধ এখনও গবেষণাধীন ও পরীক্ষামূলক এবং এদের মধ্যে যে দুটি ঔষধ জাতে উঠেছে সে দুটির মধ্যে একটি (ডাঃ সান্যালের বড়ি) অনায়াসলভ্য নয়। অপরটি (প্রাইমোলিউট-এন) ভারতে তথা কোলকাতায় পাওয়া গেলেও সাধারণের নাগালের বাইরে কেননা এতে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকার মত খরচ পড়বে।

● বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিরতরে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে অপারেশনই একমাত্র পথ। ভবিষ্যতে দেহ, মন ও রতিক্ষমতার সুস্থতা এবং যৌন-আনন্দ পুরোপুরি বজায় রেখে সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় এই অপারেশনে। একারণে ৩।৪টি সন্তানের জনক-জননী না হয়ে এই অপারেশনের আশ্রয় নেওয়া অনুচিত।

পরিশিষ্ট (৩)

জন্মরোধক দ্রব্যাদির তালিকা

আলোচ্য গ্রন্থে অনেক রকমের জন্মরোধক দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে কোনটি ভারতে পাওয়া যায় না। আবার ভারতের প্রতিটি শহরে একই রকমের জিনিস মেলে না। তাই কোলকাতায় পাওয়া যায় এমন জিনিসেরই উল্লেখ করব :

কন্‌ডম্—জান্তব কন্‌ডম্ ও যোনিবর্ম বাদে সব রকমেরই কন্‌ডম্ কোলকাতায় পাওয়া যায়। এত বিবিধ কোম্পানির কন্‌ডম্ পাওয়া যায় যে প্রত্যেকটির নাম বলা বেশ শক্ত। এদের মধ্যে লণ্ডনের ডুরেক্স কোম্পানিকৃত ডুরেক্স, ডুরাপ্যাক্, সুপারট্যান এবং আমেরিকার সিলভারটেক্স, কয়েনপ্যাক্, সেলো প্রভৃতি পাতলা কন্‌ডম্ বেশ ভাল। পিচ্ছিল কন্‌ডম্ ও মোটা কন্‌ডম্ ডুরেক্সেরই ভাল।

ডায়াফ্রাম্—কেনবার সময় ডুরেক্স, অর্থো, কোরোমেক্স, যে কোন একটি ছাপ দেখে নেবেন। কুণ্ডলীকৃত স্প্রিংয়ের ডায়াফ্রাম্ই বেশী চলে। চ্যাপ্টা স্প্রিংয়ের ডায়াফ্রাম্ও পাওয়া যায়।

ডুমাস ও ভিমিউল ক্যাপ্—ইদানীং ডুমাস ও ভিমিউল ক্যাপ্ও কোলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে।

সার্ভাইক্যাল্ ক্যাপ্—রবারের ক্যাপ্ই মেলে। তাও ডুরেক্সের। মারী ষ্টোপসের রেসিয়্যাল ক্যাপ্ ও প্লাষ্টিক ক্যাপ্ দুর্লভ।

জেলী-ক্রীম—ভলপার পেষ্ট, কোরোমেক্স জেলী কিংবা ক্রীম, অর্থোগাইনল্ জেলী কিংবা ক্রীম, কুপার জেল্ কিংবা ক্রীম, পেটেণ্টেক্স জেলী, ডুরাক্রীম, কণ্টার্ জেলী কিংবা ক্রীম—পছন্দমত যে কোনটি

কিনতে পারেন। একক প্রয়োগের জন্যে কোরোমেক্স জেলী বা ক্রীম, প্রিসেপ্টিন্ জেলই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এদের কোনটাই না পেলে ডলপার পেষ্ট কিংবা কণ্টাব জেলী একক প্রয়োগ করা যে না যায় তা নয়। যদি শুধু পিচ্ছিলতার প্রয়োজন পড়ে কে. ওয়াই. জেলী কিংবা ডুরল জেলী কিনবেন (এটি শুক্রকীটনাশক নয়)।

ট্যাবলেট—ডলপার ফোমিং ট্যাবলেট, স্পিটন, কণ্টাব ও গাই-নোমিন, যে কোনটি কিনতে পারেন।

ডুশ—ঝর্না ডুশ সেট যে কোন ডাক্তারখানায় পাবেন। বাল্‌ব্ ডুশ জন্মরোধক প্রতিষ্ঠানে বা দোকানে।

পরিশিষ্ট (৪)

জন্মরোধক দ্রব্যাদির প্রাপ্তিস্থান

খাঁটি ও টাটকা জিনিস পেতে হলে হয় **নামকরা ডাক্তারী দোকানে,** না হয় কোন **বিশ্বস্ত জন্মরোধক প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ** হতে হবে।

এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা কিংবা কোন সমস্যা দেখা দিলে, 'ডাঃ মদন রাণা, ১৪, রাজা ব্রজেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭' এই ঠিকানায় স্ট্যাম্পসহ চিঠি লিখতে পারেন কিংবা পি-৩৫, বি. কে. পাল. এভেন্যু-স্থিত (কলিকাতা-৫) ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ক্লিনিকে রবিবার বাদে অন্য যে কোন দিনে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত আটটার মধ্যে দেখা করতে পারেন।

জন্ম নিয়ন্ত্রের যাবতীয় সামগ্রী
নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাইবেন।

বি. এন; কোং